এসলামের প্রকৃত রূপরেখা

তওহীদ প্রকাশন

এ যামানার এমাম,

এমামুয্‌যামান *(The Leader of the Time)*

মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

এসলামের প্রকৃত রূপরেখা

যামানার এমাম, এমামুয্যামান, (দ্যা লিডার অব দ্যা টাইম)

মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

এমাম, হেযবুত তওহীদ

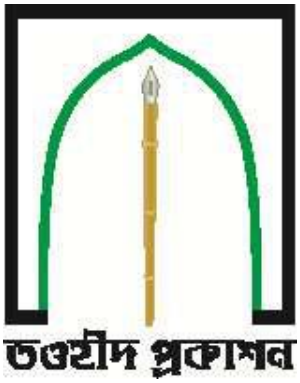

তওহীদ প্রকাশন

৩২/৩৩ পি.কে. রায় রোড, পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা

ফোন: ০১৬৭০-১৭৪৬৪৩, ০১৬৭০-১৭৪৬৫১

ISBN- 978-984-33-1561-8

প্রথম প্রকাশ। ২০০০

দশম প্রকাশ। সংশোধিত

আগস্ট ২০১০

মূল্য:

৪০.০০ টাকা মাত্র

প্রবন্ধসমূহ

১. যুগসন্ধিক্ষণে আমরা

২. এসলামের প্রকৃত আকীদা

৩. হেযবুত তওহীদের কর্মসূচি

৪. জেহাদ, কেতাল ও সন্ত্রাস

যুগসন্ধিক্ষণে আমরা

২৩ শে সেপ্টেম্বর' ৯৪, করটিয়ায় অনুষ্ঠিত সুধী সম্মেলনে হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর ভাষণ

বেসমেল্লাহের রহমানের রহিম

আমাদের, অর্থাৎ আমরা যারা নিজেদের মো'মেন, মোসলেম ও উম্মতে মোহাম্মদী বোলে মোনে কোরি, আমাদের ইতিহাস কি? আমরা কোথা থেকে এসেছি, কেমন কোরে আমাদের জন্ম হোয়েছে, কেন আমাদের সৃষ্টি করা হোয়েছে, কি উদ্দেশ্যে আমাদের একটি জাতি হিসেবে গঠন করা হোয়েছে? আজকের এই একশ' বিশ কোটির জাতির মনে এই প্রশ্নগুলি জাগে না। কেউ এই প্রশ্নগুলি কোরলে একশ' বিশ কোটির কাছ থেকে অন্তত দশকোটি রকমের বিভিন্ন উত্তর পাওয়া যায়। চৌদ্দশ' বছর আগে যখন এই জাতিটির জন্ম হোয়েছিল আল্লাহর রসুল তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা, অতুলনীয় ত্যাগ, অবিচল নিষ্ঠা, অটল অধ্যবসায় এবং সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে এই জাতিটিকে গঠন কোরেছিলেন তখন কিন্তু ঐ জাতির প্রত্যেকটি মানুষকে উপরোক্ত ঐ প্রশ্নগুলি কোরলে সবাই একই উত্তর দিতেন, কোন মতভেদ ছিলো না। ঐ জাতির ইতিহাস হোচ্ছে এই যে, জাতিটি গঠিত হবার পঁচিশ বছরের মধ্যে তদানিন্তন পৃথিবীর দুইটি মহাশক্তিকে সশস্ত্র সংগ্রামে, যুদ্ধে পরাজিত কোরে সমগ্র মধ্য এশিয়ায় আল্লাহর আইনের শাসন কার্য্যকরী কোরেছিলো। ঐ মহাশক্তিশালী সাম্রাজ্য দুইটি ছিলো রোমান ও পারসিক, একটি খ্রীস্টান অপরটি অগ্নি উপাসক। সংখ্যায়, সম্পদে, সামরিক বাহিনীর সংখ্যায়, অস্ত্রশস্ত্রে, এক কথায় সবদিক দিয়ে ঐ দুইটি বিশ্বশক্তি ছিলো ঐ শিশু জাতির চেয়ে বহুগুণে বড় কিন্তু তবুও তারা ঐ সদ্যপ্রসূত ছোট্ট জাতির সঙ্গে সামরিক সংঘর্ষে বিধ্বস্ত হোয়ে গিয়েছিলো। খ্রীস্টান শক্তিটি পরাজিত হোয়ে মধ্যপ্রাচ্য থেকেই পালিয়ে গেলো; আর অগ্নি উপাসক শক্তিটি আল্লাহর দীনকে স্বীকার কোরে নিয়ে ঐ নতুন জাতির অর্ন্তভুক্ত হোয়ে গেলো; আজ যেটাকে আমরা ইরান বলি। তারপর ৬০ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ঐ জাতিটি তখনকার দিনের অর্দ্ধেক পৃথিবী জয় কোরে আল্লাহর আইনের শাসনের অধীনে নিয়ে এলো। এই পর্য্যন্ত ঐ জাতির ইতিহাস শুধু জয়ের ইতিহাস, বিজয়ের ইতিহাস, তাদের চেয়ে বহুগুণে শক্তিশালী শক্তির বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সামরিক বিজয়ের ইতিহাস।

ঐ সামরিক বিজয়ের উদ্দেশ্য কি ছিলো? সাম্রাজ্য? নাকি অন্য ধর্মের লোকজনকে এসলাম গ্রহণে বাধ্য করা? না, এর কোনটাই নয়। এর উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ছিলো ঠিক তাই যে উদ্দেশ্য, যে লক্ষ্য অর্জনের জন্য আল্লাহর নির্দেশে তাঁর শেষ রসুল এই জাতিটিকে, এই উম্মাহটি গঠন কোরেছিলেন, আর সেটি হোল সশস্ত্র সংগ্রাম কোরে সমস্ত পৃথিবীতে আল্লাহর আইন-কানুন অর্থাৎ দীন প্রতিষ্ঠা ও কার্য্যকরী কোরে মানব জাতির ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের সমস্ত অন্যায়, অবিচার, শোষণ, অত্যাচার নিঃশেষ কোরে দিয়ে ন্যায়, সুবিচার, নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। আর এই জন্যই এই দীনের নাম এসলাম, আক্ষরিক অর্থেই শান্তি। প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত, আদম (আঃ) থেকে মোহাম্মদ (দঃ) পর্য্যন্ত ঐ একই নাম, এসলাম বা শান্তি। আজ আমাদের ধর্মীয় ও অধর্মীয় (অর্থাৎ রাজনৈতিক) নেতারা যে অর্থে এসলামকে শান্তির ধর্ম বলেন তার ঠিক বিপরীত অর্থ। রাষ্ট্রশক্তি অধিকার না কোরলে আল্লাহর আইন কেন, কোন আইনই প্রতিষ্ঠা বা কার্য্যকরী করা যায় না এটা সাধারণ জ্ঞান আর রাষ্ট্রশক্তি কেউ বিনা যুদ্ধে ছেড়ে দেয় না, এটাও জানা কথা। তাই রাষ্ট্রশক্তি তাদের অধিকার কোরতে হোয়েছে সশস্ত্র সংগ্রামে। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে একটি মানুষকেও তারা তার ধর্ম ত্যাগ কোরে এই দীন গ্রহণে বাধ্য করেন নি। শুধু তাই নয়, যেখানেই তারা আল্লাহর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা কোরেছেন সেখানেই অন্য ধর্মের চার্চ, সিনাগগ, মন্দির ও প্যাগোডা রক্ষার দায়িত্ব তো নিয়েছেনই তার উপর ঐ সব ধর্মের লোকজনের যার যার ধর্ম পালনে কেউ যেন কোন অসুবিধা পর্য্যন্ত না কোরতে পারে সে দায়িত্বও তারা নিয়েছেন। অন্যান্য ধর্মের লোকজনের ধর্মের নিরাপত্তার যে ইতিহাস এই জাতি সৃষ্টি কোরেছে তা মানব জাতির ইতিহাসে অনন্য, একক, পৃথিবীর কোন জাতি তা কোরতে পারে নি। অর্দ্ধেক পৃথিবীতে আল্লাহর আইন প্রবর্ত্তন করার ফলে ঐ সমস্ত এলাকায় লুপ্ত হোয়ে গেলো শোষণ, অবিচার, অন্যায়, নিরাপত্তাহীনতা অর্থাৎ ফাসাদ ও সাফাকুদ্দিমা। প্রতিষ্ঠিত হোল সুবিচার; ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সুবিচার ও নিরাপত্তা; এক কথায় শান্তি।

এরপর ঘোটলো এক মহাদুর্ভাগ্য জনক ঘটনা। ঐ জাতি হঠাৎ তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ভুলে গেলো। ভুলে গেলো তার জন্ম হোয়েছে কেন, ভুলে গেলো তাকে গঠন কেন করা হোয়েছিলো, ভুলে গেলো আল্লাহর রসুল স্বয়ং প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদেরকে পৃথিবীতে সবচেয়ে দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা জাতিতে কেন পরিণত কোরেছিলেন। জাতি ভুলে গেলো যে কাজের জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হোয়েছে, গঠন করা

হোয়েছে, প্রশিক্ষণ দেয়া হোয়েছে সেই কাজ ছেড়ে দেওয়া আল্লাহ ও তাঁর রসুলের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা। কিন্তু জাতির লোকদের আকীদা অর্থাৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে ধারণা বিকৃত হোয়ে যাওয়ায় জাতি তাই কোরলো, আল্লাহর দীন সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জেহাদ অর্থাৎ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, সংগ্রাম ত্যাগ কোরলো এবং ত্যাগ কোরে অন্যান্য রাজা বাদশাহরা যেমন রাজত্ব করে তেমনি শান শওকতের সঙ্গে তাদের মতই রাজত্ব কোরতে শুরু কোরলো। এই সর্বনাশা কাজের অর্থ কি, পরিণতি কি তা তারা উপলব্ধি কোরতে পারলেন না। তারা উপলব্ধি কোরতে পারলেন না যে, যে জিনিস যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয় সেটা যদি সেটাকে দিয়ে না হয়, তবে আর ঐ জিনিসের কোন দাম থাকে না, সেটা অর্থহীন হোয়ে যায়। একটা ঘড়ির উদ্দেশ্য হোচ্ছে সময় জানা, ঘড়িটা যদি না চলে, সময় না দেখায়, এমন কি যদি ভুল সময় দেখায় তবে আর সে ঘড়িটার কোন দাম থাকে না। ঘড়িটা সোনা, হীরা জহরত দিয়ে তৈরী কোরলেও না। একটি গাড়ি যদি কোন কারণে অচল হোয়ে যায়, বা আকীদার ভুলে সেটাকে ব্যবহার না কোরে গ্যারেজে রেখে দেওয়া হয় তবে সে গাড়ির আর কোন মূল্য থাকে না, সেটা পৃথিবীর সবচেয়ে দামী গাড়ি হোলেও না, কারণ যে উদ্দেশ্যে গাড়িটিকে তৈরী করা হোয়েছে অর্থাৎ একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাওয়া তা আর সেটাকে দিয়ে হোচ্ছে না। শান-শওকতের সঙ্গে রাজত্ব করার মোহ তাদের এমন ভাবে পেয়ে বোসলো যে তারা ভুলে গেলেন আল্লাহ কোর'আনে মো'মেন হবার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তার মধ্যে ঐ জেহাদ অঙ্গীভূত করা আছে। সুরা হুজরাতের ১৫ নং আয়াতে আল্লাহ বোলেছেন-"সত্যনিষ্ঠ মো'মেন শুধু তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে, তারপর (সে সম্বন্ধে) আর কোন সন্দেহ করে না (অর্থাৎ এ বিশ্বাসের উপর দৃঢ়, অবিচল থাকে) এবং তাদের সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে।" তারপর তিনি আবার বোলেছেন সুরা তওবার ১১১ নং আয়াতে- "নিশ্চয়ই আল্লাহ মো'মেনদের জীবন ও সম্পদ জান্নাতের বিনিময়ে কিনে নিয়েছেন, তারা আল্লাহর রাস্তায় কেতাল (অর্থাৎ- সশস্ত্র সংগ্রাম) করে, হত্যা করে এবং নিহত হয়। এটা এমন একটা প্রতিশ্রুতি যে প্রতিশ্রুতিতে আল্লাহ তওরাত, এনজিল ও কোর'আনে আবদ্ধ হোয়ে আছেন। নিজের প্রতিশ্রুতি পালনে আল্লাহর চেয়ে বড় আর কে আছেন? কাজেই তোমরা যে সওদা কোরেছো, সে সওদার জন্য আনন্দ কর, কারণ এই সওদা হোচ্ছে চুড়ান্ত সাফল্য।"

এছাড়া কোর'আনের অন্যত্রও আল্লাহ মো'মেন কে এবং কারা তার সংজ্ঞা আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন এবং এই সংজ্ঞায় আল্লাহ ও তাঁর রসুলে বিশ্বাস ও আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ এই দুই শর্ত

রোয়েছে। কাজেই এই জাতির পথভ্রষ্ঠ লোকেরা যখন নীতি হিসাবে জেহাদ ত্যাগ কোরলেন তখন তারা বুঝলেন না যে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের দৃষ্টিতে আর তারা মো'মেন রোইলেন না। তাদের ঐ দুভার্গ্যজনক কাজের ন্যায্যতা প্রমাণের চেষ্টায় তারা হাদীস উদ্ভাবন কোরলেন নফসের সঙ্গে জেহাদই হোচ্ছে জেহাদে আকবর, বড় জেহাদ। এই হাদীসের সংকলক এমাম বায়হাকি নিজেই স্বীকার কোরেছেন যে, এই হাদীসের সনদ ত্রুটিযুক্ত এবং এই দয়িফ হাদীস সম্বন্ধে হাফেয ইবনে হাজ্জার প্রমুখ মোহাদ্দেসরা বোলেছেন, এটা কোন হাদীসই না, এটা একটা আরবী প্রবাদ বাক্য মাত্র। তার চেয়েও বড় কথা হোচ্ছে কোন হাদীস সহীহ্ কি না তা যাচাই করার প্রথম কষ্ঠিপাথর হোচ্ছে কোর'আন। সেই কোর'আনেই আল্লাহ স্বয়ং আমাদের বোলে দিচ্ছেন বড় জেহাদ অর্থাৎ জেহাদে আকবর বা কবীর কোনটা। সুরা ফোরকানের ৫২ নং আয়াতে তিনি বোলেছেন, **"সুতরাং কাফেরদের কথামত চলো না এবং এর (কোর'আনের) সাহায্যে তাদের সঙ্গে বড় জেহাদ কর। জেহাদান কবীর কর।"** অর্থাৎ কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদই হোচ্ছে জেহাদে আকবর, নফসের সঙ্গে নয়।

শুধু তাই নয়, জেহাদ ত্যাগ কোরেই তারা ক্ষান্ত হোলেন না। তারা রসুলের সুন্নাহরও ভিন্ন সংজ্ঞা আবিষ্কার কোরলেন। আল্লাহ কোর'আনে অন্ততঃ তিনবার বোলেছেন যে, তিনি (আল্লাহ) তাঁর রসুলকে সঠিক দিক নির্দেশনা ও সত্যদীন দিয়ে পাঠিয়েছেন এই জন্য যে তিনি এটাকে অন্যান্য সমস্ত দীনের ওপর বিজয়ী কোরবেন। এই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর নবী ঘোষণা কোরলেন- **"আমি আদিষ্ট হোয়েছি সমস্ত মানব জাতির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম চালিয়ে যেতে যে পর্য্যন্ত না তারা একথা মেনে নেয় যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন এলাহ নেই, এবং মোহাম্মদ (দঃ) তাঁর রসুল"** [হাদীস- আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বোখারী]। ইতিহাস সাক্ষী যতোদিন তিনি এই দুনিয়ায় ছিলেন ততোদিন তিনি ও তাঁর আসহাব একদেহ একপ্রাণ হোয়ে আল্লাহর দেয়া ঐ আদেশ ও দায়িত্ব পালন কোরে গেছেন এবং তা কোরতে যেয়ে মাত্র ১০ বছরের মধ্যে ১০৭টি ছোট বড় যুদ্ধ কোরেছেন। তারপর যখন আল্লাহর রসুল এই দুনিয়া থেকে চোলে গেলেন তখন ঐ দায়িত্ব স্বভাবতঃই এসে পোড়লো তাঁর গঠন করা জাতিটির ওপর কারণ রসুলের ওপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব তখনও পূর্ণ হয় নি। শুধু আরব দেশটাকে আল্লাহর আইনের শাসনের মধ্যে আনা হোয়েছে; বাকী পৃথিবী মানুষের তেরী আইনের অধীনে চোলছে। রসুলাল্লাহর নিজ হাতে

গড়া জাতিটি অর্থাৎ উম্মতে মোহাম্মদী তার জান্নাতবাসী নেতার ওপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব তাদের মাথায় এসে পড়া সম্বন্ধে এত সচেতন ছিলেন যে নেতার দুনিয়া থেকে চোলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি-ঘর, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষেত-খামার পরিবার পরিজন, এক কথায় পার্থিব সব কিছু কোরবান কোরে তাদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব পূর্ণ কোরতে অস্ত্র হাতে তাদের স্বদেশ আরব থেকে বের হোয়ে পোড়েছিলেন। এই কাজকে তাদের নেতা বোলেছিলেন আমার সুন্নাহ, সুন্নাতি এবং বোলেছিলেন আমার এই সুন্নাহ যে বা যারা ত্যাগ কোরবে তারা আমার কেউ নয়, মান তারাকা সুন্নাতি ফালাইসা মিন্নি, অর্থাৎ তারা উম্মতে মোহাম্মদীই নয়। শুধু তাই নয়, তিনি বোলেছেন- মান রাগেবা আন সুন্নাতি ফালাইসা মিন্নি (বোখারী, মোসলেম) অর্থাৎ যে আমার সুন্নাহ থেকে শুধু মুখ ফিরিয়ে নেবে সেও আমার কেউ নয়। জেহাদ ছেড়ে দেবার পর নবীর সুন্নাহর বিকল্প হিসাবে নেয়া হোল তাঁর ব্যক্তিগত অভ্যাস-অনভ্যাস, পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি যেগুলোর সাথে তাঁর জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাঁর উপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্বের কোন সম্বন্ধই নেই; যেগুলো নেহায়েৎ ব্যক্তিগত ব্যাপার। নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে, জেহাদ ত্যাগকারীদের কাছে মানব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম বিপ্লবীর সুন্নাহ হোয়ে দাঁড়ালো, তাঁর বিপ্লব নয়, তাঁর মেসওয়াক করা, খাবার আগে জিহবায় একটু নিমক দেওয়া, খাবার পর একটু মিষ্টি খাওয়া, ডান পাশে শোয়ার মত ছোট-খাট অসংখ্য তুচ্ছ ব্যাপার। **মানুষের ইতিহাসে কোন জাতি তার নেতার এমন অপমানকর অবমূল্যায়ন কোরেছে বোলে আমার জানা নেই।** জেহাদ ত্যাগ কোরে ঐ জাতি মোমেন ও উম্মতে মোহাম্মদীর সংজ্ঞা থেকে বহিষ্কৃত হোয়ে যাওয়া ছাড়াও আরও ভয়ংকর পরিণতি হোলো। তাহোলো এই যে আল্লাহ সুরা তওবায় ৩৮ এবং ৩৯ নং আয়াতে এই জাতিকে জেহাদ ছেড়ে দেবার পরিণতি সম্বন্ধে এই বোলে সাবধান কোরে দিয়েছেন- "হে মো'মেনরা তোমাদের কি হোয়েছে যে যখন তোমাদের বলা হয় আল্লাহর পথে (সামরিক) অভিযানে বের হও, তখন যেন তোমরা ঝুঁকে পোড়ে মাটির সাথে মিশে যাও। (তাহোলে কি) তোমরা পরকালের পরিবর্তে এই জীবনকেই প্রাধান্য দিয়েছো? এই জীবনের ভোগ তো পরকালের জীবনের তুলনায় অতি সামান্য। **যদি তোমরা সামরিক অভিযানে বের না হও তবে তিনি তোমাদের কঠিন শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের স্থলে অন্য কোন জাতিকে প্রতিষ্ঠা কোরবেন** (অর্থাৎ তোমাদের অন্য কোন জাতির দাস, গোলাম বানিয়ে দেবেন) এবং তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি কোরতে পারবে না, আল্লাহ সমস্ত কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।" এই কঠোর সতর্কবাণী সত্ত্বেও আকীদা অর্থাৎ জাতির উদ্দেশ্য ও

লক্ষ্য সম্বন্ধে সঠিক সম্যক ধারণার (Comprehensive Conception) বিকৃতিতে এই জাতি জেহাদ ছেড়ে দিয়ে নফসের সাথে নিরাপদ জেহাদ শুরু কোরলো। আল্লাহও তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কিছুদিন পরই ইউরোপের খ্রীস্টান জাতিগুলিকে দিয়ে ঐ জাতিকে সামরিক ভাবে পরাজিত ও পর্যুদস্ত কোরে শাসনভার ও কর্তৃত্ব তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে খ্রীস্টানদের হাতে তুলে দিলেন।

আল্লাহ কোর'আনের বিভিন্ন স্থানে এবং সুরা নুরের ৫৫ নং আয়াতে মো'মেনদের এই পৃথিবীর আধিপত্য ও কর্তৃত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে যতদিন ঐ জাতি, জাতি হিসাবে জেহাদ চালিয়ে গেছে ততদিন আল্লাহ তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা কোরেছেন- অর্দ্ধেক পৃথিবীতে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হোয়েছিল এবং ঐ জাতি যদি তখন জেহাদ ত্যাগ না কোরতো তবে অবশ্যই আল্লাহ বাকি অর্দ্ধেকও তাদের হাতে তুলে দিতেন এবং রসুলের ওপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্বও পূর্ণ হতো। আল্লাহর ঐ প্রতিশ্রুতির মধ্য থেকে আরেকটি সত্য ফুটে ওঠে- সেটা হোল এই যে, আমরা নিজেদের মো'মেন অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রসুলে বিশ্বাসী বোলে দাবি কোরি। তাহোলে আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পৃথিবীর কর্তৃত্ব, আধিপত্য আমাদের হাতে নেই কেন? তাহোলে সেই সর্বশক্তিমান কি তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা কোরতে অসমর্থ (নাউযুবিল্লাহে মিন যালেক)? এর একমাত্র জবাব হোচ্ছে- আমরা যতোই নামাজ পড়ি, রোযা রাখি, যতোই হাজার রকম এবাদত কোরি, যতোই মুত্তাকী হই, আমরা মো'মেন নই, মোসলেম নই, উম্মতে মোহাম্মদী হবার তো প্রশ্নই ওঠে না। মো'মেন হোলে (ইন কুন্তুম মো'মেনীন) যে পৃথিবীর ওপর আধিপত্যের অঙ্গীকার আল্লাহ কোরেছেন, সেই পৃথিবীতে আজ আমাদের অবস্থা কী? আমাদের অবস্থা হোচ্ছে (ক) পৃথিবীতে যে কয়টি প্রধান জাতি আছে তার মধ্যে আমরা নিকৃষ্টতম। (খ) আমাদের ছাড়া আর যে কয়টি জাতি আছে তারা সকলেই পৃথিবীর সর্বত্রই আমাদের অপমানিত, অপদস্থ কোরছে, আমাদের আক্রমণ কোরে হত্যা কোরছে, আমাদের ধন-সম্পদ লুটে নিচ্ছে, আমাদের বাড়ি-ঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিচ্ছে, আমাদের মা, মেয়ে, বোনদের ওপর পাশবিক অত্যাচার কোরে সতিত্ব নষ্ট কোরছে। (গ) ঐ কাজগুলি খ্রীস্টানরা অতীতে কোরেছে স্পেনে, সেখান থেকে তারা সম্পুর্ণ মোসলেম জাতিটিকেই সমূলে উৎখাত কোরেছে, আজ সেখানে মোসলেম বোলতে নেই এবং বর্ত্তমানে কোরছে বসনিয়া হারযেগোভিনিয়ায়, সুদানে, ফিলিপাইনে। খ্রীস্টানরা বসনিয়ায় যা কোরেছে মানব জাতির ইতিহাসে তার কোন নজির নাই। তারা দুই লক্ষ মোসলেম মেয়েকে ধর্ষণ কোরে গর্ভবতী কোরেছে, তাদের সাতমাস পর্য্যন্ত আটকে রেখেছে যাতে তারা ঐ খ্রীস্টানদের ঔরসের সন্তানগুলি গর্ভপাত

কোরে ফেলে দিতে না পারে। বসনিয়ায় কয়েক হাজার মসজিদের মধ্যে সারায়েভোর কয়েকটি মাত্র মসজিদ ছাড়া আর সমস্ত মসজিদ ভেংগে দেয়া হোয়েছে। হিন্দুরা কোরছে কাশ্মীরে, ভারতের প্রতিটি রাজ্যে। বৌদ্ধরা কোরছে মায়ানমারে অর্থাৎ বার্মায়, আরাকানে, থাইল্যান্ডে, ভিয়েতনামে, কামপুচিয়ায় ও চীনে। এগুলিতো বড় বড় জাতি। অতি ক্ষুদ্র ইহুদী জাতি ঐ কাজ কোরছে পশ্চিম এশিয়ায়, প্যালেস্টাইনে। ভারতে দশ হাজারের বেশী মসজিদ হয় মন্দীরে পরিণত করা হোয়েছে না হয় অফিস ইত্যাদি অন্য কাজে ব্যবহার করা হোচ্ছে, না হয় ভেংগে দেয়া হোয়েছে। এটা ১৯৮৫ সালের হিসাব। ক্ষুদ্র ইহুদী জাতিকে দিয়ে ১৯৪৭ সন থেকে আজ পর্য্যন্ত গুতিয়ে মেরেও খুশী না হোয়ে অপমানের, শাস্তির চুড়ান্ত করার জন্য গাছ পাথর উপাসক আসামের একটি পাহাড়ী উপজাতি দিয়ে আল্লাহ এই জাতিকে পেটাচ্ছেন, গুলী কোরে, কুপিয়ে হত্যা করাচ্ছেন, বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে উচ্ছেদ করাচ্ছেন। আর কত শাস্তি, কত আযাব আল্লাহ দেবেন? এর পরের ধাপের শাস্তিতো একেবারে নির্মূল কোরে দেয়া- যেমন দিয়েছেন স্পেনের তথাকথিত মোসলেমদের, সেখানে এখন তাদের নাম গন্ধও নেই।

আল্লাহর নবী ঈসাকে (আঃ) প্রত্যাখ্যান করার শাস্তি হিসাবে আল্লাহ ইহুদী জাতিকে লা'নত অর্থাৎ অভিশাপ দিয়েছিলেন, যার ফলে খ্রীস্টান রোমানরা তাদের হাজার হাজার বছরের স্বদেশ থেকে মেরে কেটে উৎখাত কোরে দিয়েছিলো। প্রাণ বাঁচাবার জন্য তারা পালিয়ে যেয়ে ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে আশ্রয় নিয়েছিলো। আল্লাহর অভিশাপ তাদের পেছনে পেছনে গেছে। যেখানেই তারা আশ্রয় নিয়েছে, বসতি স্থাপন কোরেছে সেখানেই তাদের ঘৃণার চোখে দেখা হোয়েছে, অবজ্ঞা করা হোয়েছে। মাঝে মাঝেই খ্রীস্টানরা দলবেধে ইহুদীদের বসতি আক্রমণ কোরে তাদের পুরুষদের হত্যা কোরে মেয়েদের নিয়ে গেছে, তাদের সম্পত্তি লুটপাট কোরেছে, বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে। ইউরোপের প্রতিটি রাষ্ট্রে এটা হোয়েছে এবং বারবার হোয়েছে। এই কাজটাকে বোঝাবার জন্য ইউরোপীয় ভাষায় একটি নতুন শব্দেরই জন্ম হোয়েছে Pogrom, যার আভিধানিক অর্থ হোল Organised killing and plunder of a community of people, বাংলায়- সুসংগঠিত ভাবে সম্প্রদায় বিশেষের হত্যা ও লুন্ঠন। আল্লাহ লা'নত দেবার পর ইহুদীদের ভাগ্যে যা ঘোটেছিলো আজ মোসলেম নামের এই জাতিটির ওপর ঠিক তাই ঘোটছে। তফাৎ শুধু এইটুকু যে, ইহুদী জাতির ওপর ঐ Pogrom ইউরোপের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো আর আমাদের ওপর Pogrom হোচ্ছে সমস্ত

পৃথিবীময়। এক কোটির ছোট্ট ইহুদী জাতি আজ আমাদের একশ' বিশ কোটির এই জাতির ওপর Pogrom কোরছে। অভিশপ্ত অর্থাৎ মালাঊন হবার যে সব চিহ্ন ইহুদী জাতির গায়ে লেখা হোয়েছিলো সে সব চিহ্ন আজ এই জাতির গায়ে লেখা। সারা শরীরে আল্লাহর অভিশাপের ছাপ নিয়ে যে নামায রোজা এবং আরও হাজার রকমের এবাদত করা হোচ্ছে তা আল্লাহর দরবারে কবুল হোচ্ছে মোনে কোরে আমরা আহাম্মকের স্বর্গে বাস কোরছি।

মো'মেন, মোসলেম ও উম্মাতে মোহাম্মদী বোলে পরিচিত এই জাতিটি আকীদার বিকৃতিতে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের দেখানো দিক নির্দেশনা, হেদায়াতের ঠিক বিপরীত দিকে চলার ফলে আল্লাহর চোখে এটা আর মো'মেনও নেই, মোসলেমও নেই, উম্মতে মোহাম্মদীও নেই। এই জাতি এখন আল্লাহর লা'নতের ও গযবের বস্তু, এর অবস্থা এখন অতীতের অভিশপ্ত ইহুদী জাতির চেয়েও নিকৃষ্ট। আল্লাহর রসুলের গঠন করা জাতিটির প্রথম একশ' বছরের অবস্থার সাথে বর্ত্তমান অবস্থার একটা তুলনা এ কথা প্রমাণ কোরবে।

আল্লাহ রসুলের প্রকৃত এসলাম ও মোসলেম জাতি	**বর্তমানের বিকৃত এসলাম ও এই জাতি**
১। সংখ্যায় পাঁচ লাখের মত।	১। সংখ্যায় একশ' ষাট কোটি।
২। জাতির প্রাকৃতিক সম্পদ- শূন্য - কিছুই ছিলো না।	২। পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদের এক বিরাট অংশের মালিক। যে তেল ও গ্যাস ছাড়া বর্তমান ইহুদি খ্রিস্টান যান্ত্রিক সভ্যতা অচল, সেই তেলের শতকরা ৬০ ভাগ এবং গ্যাসের একটা বিরাট অংশ এই জাতির হাতে। এ ছাড়াও পৃথিবীর অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের এক প্রধান অংশের মালিক।
৩। ঐ পাঁচ লাখের জাতির মধ্যে মাত্র ৪০ জনের	৩। বর্তমানে এই জাতির মধ্যে কোটি কোটি লোক লেখা পড়া জানে, লক্ষ লক্ষ লোক উচ্চ

মত লোক লেখা পড়া জানতেন।	শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, আইনজ্ঞ, বিজ্ঞানী, শিল্পী এবং লক্ষ লক্ষ মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা, হাফেজে কোর'আন, ফকিহ, মোহাদ্দেস, আলেম ওলামা, পীর-মাশায়েখ ইত্যাদি সবই আছে।
৪। ঐ জাতির কাছে আল্লাহর দেয়া সংবিধান কোর'আনের মাত্র কয়েকটি হাতে লেখা কপি ছিল, তাও খলিফা ওসমানের (রা:) সময়ের পরে।	৪। বর্তমানে এই জাতির কাছে কোর'আনের কোটি কোটি কপি পৃথিবীর সর্বত্র বিদ্যমান। একমাত্র বাইবেলের সংখ্যার সাথে কোর'আনের সংখ্যার তুলনা করা যায়, এমন কি অনেকের মতে বাইবেলের চেয়েও বেশী।
৫। কোর'আনের কোন অনুবাদ ছিলো না।	৫। বর্তমানে পৃথিবীর প্রত্যেক প্রধান ভাষায় কোর'আনের একাধিক অনুবাদ হোয়ে গেছে। এমন কি অনেক আঞ্চলিক ভাষায়ও এর অনুবাদ হোয়ে গেছে।
৬। অর্ধেক বিশ্বজয়ী ঐ জাতির বহু মানুষ বই আকারে কোর'আনকে কোনদিন চোখেই দেখেননি। তাদের মধ্যে যার যেটুকু মুখস্থ ছিলো তারা সেইটুকুই জানতেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ কোরতেন।	৬। বর্তমানে ঝকঝকে হরফে ছাপানো অতি সুন্দর কোর'আন পৃথিবীতে কোটি কোটি সংখ্যায় বর্তমান। লক্ষ লক্ষ মানুষের ঐ বিরাট কোর'আন মুখস্থ।
৭। কোর'আনের লিখিত কোন ব্যাখ্যা অর্থাৎ তাফসির ছিলো না।	৭। বর্তমানে কোর'আনের শত শত তাফসির ও হাজার হাজার ব্যাখ্যাকারী অর্থাৎ মোফাসসের আছেন।
৮। ঐ জাতি ইস্পাতের মত ঐক্যবদ্ধ ছিলো।	৮। বর্তমানের এই জাতিটি রাজনৈতিক ভাবে

	পঞ্চান্নটির মত ভৌগলিক রাষ্ট্রে, দীনের ব্যাখ্যায় বহু মযহাবে ও ফেরকায়, আধ্যাত্মিক ভাবে শত শত তরিকায় এবং ইহুদি খ্রিস্টানদের নকল কোরে হাজার হাজার রাজনৈতিক দলে ছিন্নবিচ্ছিন্ন।
৯। তদানিন্তন সভ্য পৃথিবী থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন, রোমান এবং পারসিক বিশ্বশক্তির নাম শুনলে ভয়ে কম্পমান আরব জাতিকে সেই এসলাম মাত্র দশ বছরের মধ্যে এমন দুর্ধর্ষ যোদ্ধায় রূপান্তরিত কোরেছিলো যে ঐ মহাশক্তিধর রোমান এবং পারসিকরা যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের সামনে ঝড়ের মুখে তুলোর মত উড়ে গিয়েছিলো; একবার নয়, বহুবার। যে আরবদের তারা মাত্র কয়েক বছর আগেই অবজ্ঞা কোরতো, পরে তাদের নাম শুনলেই তারা ভয়ে কাঁপতো।	৯। বর্তমান এসলাম এমন জাতি সৃষ্টি করে এবং কোরছে যারা পৃথিবীতে ১৬০ কোটি হওয়া সত্ত্বেও শুধু সেই খ্রিস্টানরা নয়, পৃথিবীর সমস্ত জাতিগুলির অবজ্ঞা ও ঘৃণার পাত্র এবং সে অবজ্ঞা ও ঘৃণা বোঝার শক্তিও এ জাতির নেই। অন্যান্য জাতিগুলোর বিরুদ্ধতা করার শক্তিও নেই। কখনও কোরলে পরাজয় ও অপমান অবধারিত।
১০। বিশ্বনবী মোহাম্মদের (দঃ) নেতৃত্বে সেই এসলাম দশ বছরের মোধ্যে সৃষ্টি কোরেছিলো খালেদ বিন ওয়ালিদের (রাঃ) মত আল্লাহর তলোয়ার, আলী বিন আবু তালিবের (রাঃ) মত আল্লাহর সিংহ এবং দেরারের (রাঃ) মত বহু অপরাজেয় দুর্ধর্ষ যোদ্ধা।	১০. বর্তমানের এই এসলাম ১৬০ কোটির জাতির মধ্য থেকে প্রায় দেড় হাজার বছরেও একটি মাত্র খালেদ একটি আলী বা একটিও দেরার (রাঃ) সৃষ্টি কোরতে পারে নাই।
১১। আল্লাহর- রসুলের সেই এসলাম অতি শান্ত মেজাজের, সুফী চরিত্রের আবু ওবায়দা (রাঃ) কে এমন অজেয় যোদ্ধা ও অপরাজেয়	১১। আর আজ ধর্ম সম্মন্ধে বেখেয়াল, বেপরোয়া কিন্তু সাহসী ও দাপটওয়ালা কোন মানুষকে যদি বর্তমানের এসলামের ধার্মিক

সেনাপতিতে রূপান্তরিত কোরেছিল যে তার নেতৃত্বে সেই উম্মাহ সমস্ত উত্তর সিরিয়া জয় কোরে আল্লাহর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা কোরেছিল। শুধু সেনাপতি হিসাবে নয়, একক দ্বন্দ্বযুদ্ধে অর্থাৎ Single combat -এ ঐ স্বল্পভাষী শান্ত মানুষটি রোমান এবং পারসিকদের প্রখ্যাত যোদ্ধাদের পরাজিত ও ধরাশায়ী কোরেছেন।	বানানো যায় তবে ঐ লোকটি অচিরেই একটি নিরীহ গো-বেচারা কাপুরুষে পরিণত হোয়ে যায়। অর্থাৎ আল্লাহ-রাসুলের সেই প্রকৃত এসলাম একটি শিয়ালকে সিংহে রূপান্তরিত করে আর আমাদের বর্তমানের এই এসলাম সিংহকে শিয়ালে পরিণত করে।
১২। আল্লাহর রসুলের এসলাম নির্জনবাসি কামেল সুফী সাধক ওয়ায়েস করনি (রাঃ) কে নির্জনবাস থেকে বের কোরে এনে তলোয়ার হাতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে শহীদ কোরেছিলো।	১২। আর বর্তমানের এই এসলাম যোদ্ধার হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তার হাতে তসবীহ ধোরিয়ে দিয়ে মসজিদে আর খানকায় বসিয়ে দেয়।
১৩. আল্লাহর রসুলের এসলাম সম্পূর্ণ উম্মতে মোহাম্মদীকে আল্লাহর দীন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্য অস্ত্র হাতে তাদের স্বদেশ থেকে এমন ভাবে বের কোরে দিয়েছিলো যে তাদের শতকরা আশি জনের কবর হোয়েছে বিদেশে যুদ্ধক্ষেত্রে।	১৩. বর্তমানের এসলাম এমন জাতি তৈরি করে এবং কোরছে যারা তসবীহ হাতে মসজিদে, খানকায় বোসে থাকে এবং কোন রকম বিপদের আভাষ পেলেই হাওয়ার বেগে ইঁদুরের মত গর্তে লুকিয়ে যায়। এ সম্বন্ধে অতি সাম্প্রতিক একটি ঘটনা উল্লেখ না কোরে পারছিনা। কাশ্মীরে মোজাহেদদের পাতা মাইন ফেটে কয়েকটি ভারতীয় সৈন্য আহত হওয়ায় তারা রেগে গিয়ে এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে থাকে। কিছু দূরেই একটি মসজিদ ছিলো এবং সেখানে নামাযের জন্য বর্তমান এসলামের মোসল্লেরা সমবেত হোয়েছিলেন। গুলির শব্দে ঐ মোসল্লেরা প্রাণের ভয়ে আতঙ্কিত হোয়ে দৌঁড়ে মসজিদ থেকে বের হোয়ে পালাতে যেয়ে নয় জন এক কুয়োর মধ্যে

	পড়ে যান। পাঁচজন ঐখানেই মারা যান এবং চার জনের খবর জানা যায় নাই। খবরটা এদেশের সব দৈনিকেই বের হোয়েছিলো - আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছি ১০ই সেপ্টেম্বরের New-nation (১৯৯৪) থেকে। মৃত্যু ভয়ে কতখানি দিশাহারা হোলে মানুষ অমন ঘৃণিতভাবে মোরতে পারে। [এমন লজ্জার ঘটনা শুধু যে ঐ কাশ্মীরেই ঘোটেছে তা নয়, অনুরুপ অবস্থায় পৃথিবীর যে কোন মসজিদে কাপুরুষতার ঐ রকম ঘটনাই ঘোটবে। অতিসম্প্রতি আমাদের দেশেও এরকমই একটি ঘটনা ঘোটেছে। আল্লাহ ও রসুলের অবমাননাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল কোরতে গিয়ে পুলিসের ধাওয়া খেয়ে হাজার হাজার মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষক এমাম সাহেবরা এমনভাবে পালিয়েছেন যে পালাতে গিয়ে দিশেহারা হোয়ে কয়েকজন ঝাঁপ দিয়েছেন পদ্মানদীতে। এর তিনদিন পরে এক মাদ্রাসা ছাত্রের লাশ নদী থেকে উদ্ধার করা হয় (২৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৩- দৈনিক ইত্তেফাক)। মৃত্যু ভয়ে কতখানি দিশাহারা হোলে মানুষ অমন ঘৃণিতভাবে মোরতে পারে। এমন লজ্জার ঘটনা শুধু যে ঐ কাশ্মীরেই ঘোটেছে তা নয়, অনুরুপ অবস্থায় পৃথিবীর যে কোন মসজিদে কাপুরুষতার ঐ রকম ঘটনাই ঘোটবে।]
১৪. আল্লাহর রসুলের এসলাম যে জাতি গঠন কোরেছিলো সে জাতির চরিত্রের সর্ব প্রধান	১৪. বর্তমানের এসলাম যে জাতি গঠন করে তার চরিত্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হোচ্ছে

বৈশিষ্ট্য ছিল যোদ্ধার চরিত্র, তার প্রমাণ জাতির নেতা আল্লাহর রসুল (দঃ) সহ সমস্ত জাতির মধ্যে এমন একটা লোকও বোধ হয় খুঁজে পাওয়া যেতনা যার শরীরে অস্ত্রের আঘাত নেই।	কাপুরুষতা। ছোট বড় সমস্ত রকম সংঘর্ষ, বিপদ আপদ থেকে পলায়ন। যে যতো বেশী ধার্মিক সে তত বেশী কাপুরুষ; অস্ত্রের আঘাত তো দূরের কথা, এদের গায়ে সুচের খোঁচারও দাগ নেই।
১৫. আল্লাহর রসুলের এসলাম তাঁর জাতির মধ্যে যে নারী সৃষ্টি কোরেছিলো তাদের মায়েরা নিজেদের ছেলেদের যুদ্ধের পোষাক পরিয়ে মাথায় শিরস্ত্রাণ, কোমরে তলোয়ার ঝুলিয়ে দিয়ে হাত তুলে দোয়া কোরতেন, হে আল্লাহ! আমার ছেলে যেন যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফিরে না আসে। তুমি তার শাহাদাত কবুল কর।	১৫. বর্তমানের এসলামে যুদ্ধতো নেই-ই, যদি ব্যতিক্রম হিসাবে কোন ছেলে জেহাদের জন্য মায়ের অনুমতি চায় তবে তার মা চিৎকার করে অজ্ঞান হোয়ে যান।
১৬. আল্লাহর রসুলের এসলামের মেয়েরা রসুলাল্লাহর (দঃ) পাশে দাঁড়িয়ে তলোয়ার ও তীর ধনুক নিয়ে যুদ্ধ কোরেছেন এবং রসুল (দঃ) দুনিয়া থেকে চোলে যাবার পর অস্ত্র ও তাবুর খুঁটি দিয়ে পিটিয়ে খ্রিস্টানদের শিক্ষিত যোদ্ধাদের পরাজিত কোরেছেন।	১৬. বর্তমানে এসলামের ধার্মিক মেয়েদের তাদের বাক্সবন্দী অবস্থা থেকে বের কোরে চৌরাস্তার মোড়ে ছেড়ে দিয়ে আসলে তারা ওখান থেকে আর বাড়ি ফিরতে পারেন না, ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে থাকেন।

সুধীমণ্ডলী। আল্লাহর রসুল চৌদ্দশ' বছর আগে এসলামের যে শেষ সংস্করণটি মানব জাতিকে উপহার দিয়েছিলেন সেটি এবং বর্ত্তমানে আমরা যে এসলাম বোলে পরিচিত দীনটি পালন কোরছি এই দুইটি যে শুধু ভিন্ন নয়, একেবারে বিপরীতমুখী দু'টি পথ তা দেখাতে সংক্ষেপে মাত্র ১৬টি প্রমাণ উপস্থাপিত কোরলাম। এ লিষ্টি আরও অনেক বড় করা যায়, তা আর কোরলাম না। প্রকৃত সত্য হোচ্ছে এই যে, আল্লাহর অবতীর্ণ এসলামের চরিত্র হোচ্ছে বহির্মুখী অর্থাৎ Extrovert এবং বিস্ফোরণমুখী অর্থাৎ Explosive এবং বর্ত্তমানে আমাদের এসলাম বিকৃত হোয়ে- হোয়ে গেছে

অন্তর্মুখী, Introvert এবং সংকোচনশীল অর্থাৎ Implosive । বিকৃত এবং বিপরীতমুখী এই এসলামকেই আমরা সঠিক এসলাম মোনে কোরে যথাসাধ্য তা পালন করার চেষ্টা কোরছি। এই এত বড় ভুল, এত বড় গোমরাহীর কারণ কি? এর কয়েকটি কারণ আছে। সর্বপ্রধান কারণ হোচ্ছে আকীদার বিকৃতি ও লোপ। এখানে আকীদা নিয়ে আলোচনায় যাব না কারণ হেযবুত তওহীদ থেকে প্রকাশিত 'এসলামের প্রকৃত আকীদা' নামের ছোট্ট বইটিতে আকীদা সম্বন্ধে মোটামুটি লেখা হোয়েছে। এখানে শুধু এইটুকু বোলবো যে আকীদার বিকৃতিতে এই দীন সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা কোরে এবলিসের চ্যালেঞ্জে আল্লাহকে জয়ী করার সংগ্রাম, জেহাদ ত্যাগ কোরে রাজত্ব করা আরম্ভ করায় আল্লাহ ঐ জাতির অভিভাবকত্ব ত্যাগ কোরলেন এবং কোর'আনের সুরা তওবার ৩৯ নং আয়াতে তাঁর সাবধানবাণী ও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজত্ব ও রাষ্ট্রশক্তি ঐ জাতির হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ইউরোপের বিভিন্ন খ্রীস্টান জাতিগুলির হাতে তুলে দিলেন এবং মোসলেম বোলে পরিচিত ঐ জাতিটিকে তাদের দাস, গোলাম বানিয়ে দিলেন। এখানে একথা উপলব্ধি কোরতে হবে যে যখন মো'মেন মোসলেম ও উম্মতে মোহাম্মদী বোলে পরিচিত ঐ জাতিটিকে আল্লাহ খ্রীস্টানদের দিয়ে সামরিক ভাবে পরাজিত কোরে দিলেন তখন স্বভাবতঃই ঐ জাতি আর প্রকৃতপক্ষে মো'মেন, মোসলেম বা উম্মতে মোহাম্মদী এর কোনটাই রোইল না। কারণ কোর'আনে আল্লাহ একাধিকবার পরিষ্কার বোলেছেন যে, সামরিক সংঘর্ষে মো'মেন জাতিকে কখনই তিনি শত্রুর হাতে পরাজিত হোতে দেবেন না, এটা তাঁর সুন্নাহ, তাঁর চিরস্থায়ী এবং অপরিবর্ত্তনীয় সুন্নাহ (সুরা ফাতাহ ২২ এবং ২৩ নং আয়াত)। আল্লাহর রসুলও বোলে গেছেন যে, আল্লাহর কাছ থেকে তিনি প্রতিশ্রুতি পেয়েছেন যে তাঁর উম্মাহ কখনও শত্রুর কাছে সামরিক ভাবে পরাজিত হবে না [সাওবান ও খাব্বাব (রাঃ) থেকে মোসলেম, তিরমিযি ও নাসায়ী]। খ্রীস্টানদের হাতে সামরিক পরাজয়ই প্রমাণ কোরে দিলো যে আল্লাহর চোখে ঐ জাতি, জাতি হিসাবে মো'মেন রোইলো না এবং মো'মেন রোইলো না অর্থই মোসলেমও রোইলো না, উম্মতে মোহাম্মদীও রোইলো না।

ঐ জাতিকে দাসে পরিণত করার পরও খ্রীস্টান জাতিগুলির মনে ঐ দাস জাতির সম্বন্ধে ভয় সম্পুর্ণ দুর হোলো না, কারণ তখনও তাদের মন থেকে সেই ইতিহাস সম্পুর্ণ মুছে যায় নি যে, অতীতে ঐ জাতির হাতে কতবার তারা সামরিক ভাবে পরাজিত হোয়েছিল। তারা জানতো, যে জাতিকে তারা এখন পরাজিত ও পদানত কোরেছে সে জাতির প্রচণ্ড শক্তির উৎস হোচ্ছে তাদের কোর'আন ও হাদীস। এই কোর'আন ও হাদীস এবং তাদের নবীর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণই তাদের এক অপরাজেয়

দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা জাতিতে রূপান্তরিত কোরেছিল যারা একদিন ইউরোপীয় খ্রীস্টানদের মধ্যপ্রাচ্য থেকে বিতাড়িত তো কোরেছিলোই, শুধু তাই নয় তাদের ইউরোপের মধ্যেও অর্দ্ধেক ঢুকে পোড়েছিলো। তাই এই জাতি সম্পর্কে সম্পুর্ণ নিরাপদ ও নিশ্চিত হবার জন্য, এই জাতিটিকে সম্পুর্ণ পঙ্গু কোরে দেবার জন্য তারা এক শয়তানি ফন্দি আটলো। সে ফন্দি হোল এই যে, সমস্ত মোসলেম দুনিয়ায় খ্রীস্টানেরা যার যার অধিকৃত অংশে মোসলেমদের "এসলাম" শিক্ষা দেবার জন্য মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা কোরলো। ইংরাজরা এই উপমহাদেশে, মালয়েশিয়ায়, মিশরে ইত্যাদিতে; ফরাসিরা আলজেরিয়া এবং অন্যান্য যে সব মোসলেম এলাকা দখল কোরেছিল সেখানে; ডাচ অর্থাৎ ওলন্দাজরা ইন্দোনেশিয়ায় ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে মাদ্রাসা স্থাপন কোরলো। ইংরাজ অধিকৃত এই উপমহাদেশের বড়লাট অর্থাৎ Viceroy মিঃ ওয়ারেন হেসটিংস ১৭৮০ সনে কোলকাতায় আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা কোরলেন। এই মাদ্রাসায় "এসলাম" শিক্ষা দেবার জন্য খ্রীস্টান পণ্ডিতরা, যাদের ইংরাজিতে বলা হয় Orientalists, সম্মিলিত ভাবে বহু গবেষণা কোরে একটি নুতন "এসলাম" দাঁড় করালেন, **যে "এসলামের" বাহ্যিক দৃশ্য এসলামের মতই** কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যেটার আকীদা এবং চলার পথ অর্থাৎ সেরাত, আল্লাহর রসুলের এসলামের, **সেরাতুল মুস্তাকিমের ঠিক বিপরীত।** ঐ বিপরীতমুখী এসলাম শিক্ষা দিতে কি কি বিষয় শিক্ষা দিতে হবে, কি কি বিষয়বস্তু বাদ দিতে হবে, কেমন কোরে শিক্ষা দিতে হবে অর্থাৎ এক কথায় **Syllabus এবং Curriculum নির্দ্ধারণ ও স্থির কোরলেন ঐ খ্রীস্টান পণ্ডিতরা।** ঐ Syllabus ও Curriculum এ আল্লাহর সর্বব্যাপী তওহীদকে সংকুচিত কোরে ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ করা হোলো, কারণ সার্বভৌমত্ব তো বৃটিশের, **আল্লাহর সার্বভৌমত্ব শিক্ষা দিলে তো তাদের রাজত্ব করাই বিপদজনক।** তারপর আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ তওহীদের ঠিক পরেই যে জেহাদের স্থান সেই জেহাদকে ঐ মাদ্রাসার পাঠ্যবস্তুতে অতি অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে পরিণত কোরে প্রায় বাদ দেওয়া হোলো। সমষ্টিগত, জাতিগত বিষয়গুলিকে নিম্নস্তরে নামিয়ে দিয়ে অতি সাধারণ ব্যক্তিগত বিষয়গুলিকে অতি গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেয়া হোলো। নামাজ, রোযা, বিয়ে-শাদী, বিবি তালাক, দাড়ি-টুপি, পাজামা, পাগড়ী, মেসওয়াক, কুলুখ, ওজু গোসল, হায়েয-নেফাস ইত্যাদি হাজার রকমের বিষয়গুলিকে এসলামের অতি জরুরী এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোলে উপরে স্থান দেয়া হোলো। ঐ সিলেবাসে (Syllabus) আরও প্রাধান্য দেয়া হোল সেই সব বিষয়গুলিকে যেগুলি সম্বন্ধে দুর্ভাগ্যক্রমে **বিভিন্ন মাযহাবে ও ফেরকায় মতভেদ ও বিতর্ক আগে থেকেই মওজুদ ছিল ও আছে।** খ্রীস্টান পন্ডিতেরা এটা কোরলেন

এই জন্য যে তাদের শেখানো এসলামের আলেমরা যেন ঐগুলি নিয়ে নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কি, বাহাস ও প্রয়োজনে মারামারি কোরতে থাকে, বৃটিশদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হোতে না পারে এবং তাদের শাসন নিরাপদ হয়। এই দাস জাতির আরেকটি অংশ, যেটি আল্লাহর সান্নিধ্যলাভের জন্য তাসাওয়াফ নিয়ে ব্যস্ত ছিলো তাদের সম্বন্ধে বৃটিশ খ্রীস্টানদের কোন দুঃশ্চিন্তা ছিল না। কারণ তারা জানতো ঐ অংশটি তসবিহ হাতে খানকায়, হুজরায় আর মসজিদের চার দেয়ালের মধ্যেই আবদ্ধ আছে; সমাজ, রাষ্ট্র ব্যবস্থা আল্লাহর আইন মোতাবেক চোলছে, না খ্রীস্টান বা হিন্দু বা ইহুদীদের আইনে চোলছে সে ব্যাপারে তারা সম্পুর্ণ নিস্পৃহ। শুধু ঐটুকু কোরেই ইংরেজরা ক্ষান্ত হোল না। আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা কোরে তাদের সৃষ্ট "এসলাম" শিক্ষা দিতে কোথাও কোন বাধা না আসতে পারে সে জন্য **মাদ্রাসা পরিচালনার জন্য পূর্ণ ক্ষমতাসহ অধ্যক্ষ পদটি তারা নিজেদের হাতেই রাখলো।** প্রথম অধ্যক্ষপদে নিয়োজিত হোলেন Dr. A. Springer M.A । ১৭৮০ থেকে ১৯২৬ সন পর্য্যন্ত এই ১৪৬ বছর একাধিক্রমে ২৬ জন খ্রীস্টান পণ্ডিত আলীয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষপদে থেকে এই জাতিকে "এসলাম" শিখিয়েছেন। তারা কোন্ "এসলাম" শিখিয়েছেন? অবশ্যই তারা আল্লাহ রসুলের সেই প্রকৃত এসলাম সেখান নাই, যে এসলামের সৃষ্ট দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধাদের হাতে তারা বার বার পরাজিত হোয়ে মধ্যপ্রাচ্য থেকে পালিয়ে যেয়েও নিস্তার পান নাই, যে যোদ্ধারা তাদের তাড়া কোরে ইউরোপের মধ্যে অর্দ্ধেক ঢুকে পোড়েছিল। খ্রীস্টান পণ্ডিতরা তাদের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাগুলিতে শিখিয়েছেন তাদের তৈরী করা এমন একটি এসলাম যেটা তৈরী করে মৃত্যুভয়ে ভীত কাপুরুষ, যারা দাড়ি, মোচ, টুপি, পাগড়ি, মেসওয়াক, কুলুখ, হায়েয-নেফাস, যিকির আসকার আর বিবি তালাককেই এসলাম মোনে কোরে তাই নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে বাহাস আর মারামারি কোরতে থাকে যাতে খ্রীস্টানরা নিশ্চিন্ত মোনে তাদের দাসদের ওপরে রাজত্ব কোরতে পারে। ১৪৬ বছর ধোরে নিজেদের তৈরী "এসলাম" শেখাবার পর ২৬ নং খ্রীস্টান অধ্যক্ষ Mr. Alexander Hamilton Harty ১৯২৭ সনে অধ্যক্ষপদ শামসুল ওলামা, কামাল উদ্দিন আহমদ এম.এ.আই.আই.এস এর হাতে ছেড়ে দেন।

আলীয়া মাদ্রাসার শিক্ষা পদ্ধতিতে নিজেদের সাফল্য দেখে বৃটিশরা এই উপমহাদেশসহ তাদের অধিকৃত অন্যান্য মোসলেম দেশগুলিতেও আলীয়া মাদ্রাসার অনুকরণে শত শত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করে ও তাদের তৈরী "এসলাম" শিক্ষা দেয়। **ইংরাজ চোলে গেছে কিন্তু তাদের তৈরী করা "এসলাম" আজও আমাদের মাদ্রাসাগুলিতে শিক্ষা দেওয়া হোচ্ছে, ঐ মাদ্রাসাগুলি**

থেকেই ঐ এসলাম শিখে আলেমরা বের হোয়ে আসছেন ও আমাদের ঐ "এসলাম"ই শিক্ষা দিচ্ছেন। আমরা আজ এসলাম বোলতে সেই এসলামই বুঝি যে "এসলাম" খ্রীস্টান পণ্ডিতরা তৈরী কোরে ১৪৬ বছর ধরে আমাদের শিক্ষা দিয়েছে। ফলে আজ আমাদের রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক জীবন পরিচালিত হোচ্ছে পাশ্চাত্যের খ্রীস্টানদের তৈরী করা নানা রকম তন্ত্র-মন্ত্র দিয়ে আর ব্যক্তিগত ধর্মীয় জীবন পরিচালিত হোচ্ছে খ্রীস্টান পণ্ডিতদের তৈরী করা "এসলাম" দিয়ে, আল্লাহ রসুলের এসলাম দিয়ে নয়। ভাবতে অবাক লাগে এর পরও আমরা নিজেদের মো'মেন, মোসলেম ও উম্মতে মোহাম্মদী বোলে বিশ্বাস কোরি এবং পরকালে আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাতের আশা কোরি।

সমবেত সুধীগণ! আল্লাহ তাঁর অসীম রহমতে আমাদের জন্য কোন্ এসলাম তাঁর শ্রেষ্ঠ রসুল দিয়ে এনায়েত কোরছেন, কোন্ এসলাম তিনি কবুল কোরবেন তা আমাদের এই হেযবুত তওহীদকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সম্পুর্ণ দিয়েছেন কিনা জানি নাতবে যেটুকু দিয়েছেন তাই-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এই হেযবুত তওহীদ থেকে আমরা মানুষকে ডাকছি সেই প্রকৃত এসলামের দিকে- **যে এসলামের ভিত্তি তওহীদ, সর্বব্যাপী তওহীদ, যার স্তম্ভ, থাম সালাহ (নামায) এবং যার ছাদ জেহাদ** [হাদীস- মুয়ায (রাঃ) থেকে আহমদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, মেশকাত)]। আমরা আপনাদের আহ্বান কোরছি- আপনারা শুনুন আমরা কি বলি, আমাদের আকীদা কি, আমাদের ঈমান কি, আমাদের আমল কি তারপর সিদ্ধান্ত নিন। হেদায়াহ অর্থাৎ দিক নির্দেশনা আমাদের হাতে নেই, ওটা আল্লাহর নবীদের হাতেও ছিলো না। হেদায়াহ একমাত্র আল্লাহর হাতে। আমরা শুধু ডাকতে পারি। তাই আমরা ডাকছি, আহ্বান কোরছি। আমরা আহ্বান কোরছি- **বর্ত্তমানের চালু এই এসলামটা আসলে আল্লাহ রসুলের এসলামই নয়, খ্রীস্টান এসলাম, এই খ্রীস্টান এসলাম পরিত্যাগ কোরে, প্রত্যাখ্যান কোরে আবার আল্লাহ রসুলের প্রকৃত এসলামে প্রবেশ কোরতে।** আমরা জানি এই আহ্বান সহজ নয়, কারণ শত শত বছর ধোরে যে দীন বিকৃত হোয়ে গেছে এবং খ্রীস্টানদের তৈরী করা যে আকীদা আমাদের মন-মগজের গভীরে ঢুকে স্থায়ী আসন কোরে নিয়েছে, তাকে উপড়ে ফেলে সেখানে আবার আল্লাহ রসুলের দেয়া প্রকৃত আকীদাকে প্রতিষ্ঠা করা হেলা-খেলা কথা নয়। কিন্তু সহজই হোক আর কঠিনই হোক আহ্বান আমাদের কোরতেই হবে নইলে বিচারের দিন আল্লাহকে আমাদের কোন কৈফিয়ৎ দেবার থাকবে না।

আল্লাহর কাছে আমাদের শুধু এই জবাবই হবে- আমরা তোমার প্রকৃত এসলামের দিকে, তোমার প্রকৃত তওহীদ, সেরাতুল মুস্তাকিমের দিকে মানুষকে ডেকেছি- তোমার কোর'আনের সুরা নহলের ১২৫ নং আয়াতের নির্দেশ অনুযায়ী অর্থাৎ হেকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং সদ্ভাবে, কিন্তু ঐ আয়াতেই তুমিই বোলেছো তোমার পথ ছেড়ে কে বিপথগামী হয় এবং কে তোমার পথে থাকে সে সম্বন্ধে তুমি সম্পুর্ণ অবহিত, সচেতন। ইয়া আল্লাহ। হেযবুত তওহীদের এই প্রচেষ্টা তুমি কবুল কর। তোমার অসীম শক্তি থেকে আমাদের সাহায্য কর। বর্ত্তমানের বিকৃত ও বিপরীতমুখী খ্রীস্টান এসলাম থেকে তোমার বান্দাদের উদ্ধার কোরে তুমি যে দীন আদম (আঃ) থেকে মোহাম্মদ (দঃ) পর্য্যন্ত নাযেল কোরেছো, সেই দীনুল এসলাম, সেই দীনুল কাইয়্যেমায় সেই দীনুল হক-এ, সেই দীনুল ফেতরায় আমাদের আবার প্রবেশ করাও। আমরা তোমার কাছে ক্ষমা চাই। তুমি তোমার অপার ক্ষমায় আমাদের মাফ করো, আমাদের হেদায়াত করো এবং আমাদের আবার তোমার তওহীদ আর তোমার শেষ রসুলের শিক্ষা পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠা কোরে তোমাকে এবলিসের বিরুদ্ধে জয়ী করার জেহাদের সুযোগ কোরে দাও।

-আমীন।

এসলামের প্রকৃত আকীদা

এই দীনের সমস্ত আলেম ও ফকিহদের অভিমত হোচ্ছে এই যে **আকীদা সঠিক না হোলে ঈমানের কোন দাম নেই।** অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা সন্দেহ নেই, কারণ যে জিনিসটি সঠিক না হোলে, ভুল হোলে, ঈমানের কোন দাম নেই- সেই জিনিসটি অবশ্যই অতি গুরুত্বপূর্ণ। নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, ইত্যাদি এবং তাছাড়াও আরও হাজারো রকমের এবাদতের মূলে হোচ্ছে ঈমান। কিসের ওপর ঈমান? আল্লাহর, তাঁর রসুলদের, মালায়েকদের, হাশরের দিনের বিচারের, জান্নাত, জাহান্নাম, তকদীর ইত্যাদির ওপর ঈমান। এই ঈমান অর্থহীন হোয়ে গেলে স্বভাবতঃই এই নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত এবং অন্যান্য সমস্ত রকমের এবাদতও অর্থহীন। যে জিনিস সঠিক না হোলে ঈমান এবং ঈমান ভিত্তিক সমস্ত এবাদত অর্থহীন সেই মহাগুরুত্বপূর্ণ আকীদা কী?

আকীদা হোচ্ছে কোন জিনিস বা ব্যাপার সম্বন্ধে সঠিক ও সম্যক ধারণা অর্থাৎ Comprehensive concept । কোন জিনিস বা ব্যাপার, তা সে যে কোন জিনিস হোক না কেন, সেটা দিয়ে কি হয়, সেটার উদ্দেশ্য কি সে সম্বন্ধে সম্যক ধারণা বা Comprehensive concept হোচ্ছে আকীদা। যে কোন জিনিস বা ব্যাপার সম্বন্ধে এই ধারণা পূর্ণ ও সঠিক না হোলে সেই জিনিসটি অর্থহীন। আল্লাহ তাঁর রসুলদের (আঃ) মাধ্যমে মানবজাতিকে দীন অর্থাৎ জীবন-ব্যবস্থা দিয়েছেন। **তিনি কি কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই এই দীন দিয়েছেন?** অবশ্যই নয়। নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে। যদি আমরা সেই উদ্দেশ্য না বুঝি বা যদি সেই উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুল ধারণা কোরি, তবে ঐ দীন অর্থহীন হোয়ে যাবে। এ জন্যই ফকিহরা, এমামরা সকলেই একমত যে **আকীদা অর্থাৎ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণা সঠিক না হোলে ঈমান ও সমস্ত এবাদত নিষ্ফল।** একটা উদাহরণ দিচ্ছি। মনে করুন কেউ আপনাকে একটি মটর গাড়ি উপহার দিলেন। মনে করুন এই মটর গাড়িটি এসলাম- আল্লাহ মানব জাতিকে যা উপহার দিয়েছেন। যিনি গাড়িটি উপহার দিলেন তিনি ঐ সঙ্গে গাড়িটির রক্ষণাবেক্ষণ কেমন কোরে কোরতে হবে সেই নিয়মাবলীর একটি বইও দিলেন, যাকে বলা হয় Maintenance Book । মনে করুন এই বই কোর'আন ও সহীহ হাদীস। গাড়ির উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য হোচ্ছে ওটাতে চোড়ে বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া। **এটাই হোচ্ছে গাড়িটির আসল**

উদ্দেশ্য। ওটাকে তৈরীই করা হোয়েছে ঐ উদ্দেশ্যে। কিন্তু ঐ সঙ্গে আরামে বসার জন্য তার ভিতরে গদীর আসন তৈরী করা হোয়েছে, খবর, সঙ্গীত শোনার জন্য রেডিও ক্যাসেট প্লেয়ার লাগানো হোয়েছে, গাড়িটিকে সুন্দর দেখাবার জন্য চকচকে রং করা হোয়েছে। গাড়িটির সঙ্গে যে Maintenance বই আপনাকে দেয়া হোয়েছে তাতে বলা আছে গাড়িটিতে কোন্ ধরনের পেট্রোল দিতে হবে, কত নম্বর মবিল দিতে হবে। কোথায় কোথায় চর্বি (Grease) দিতে হবে ইত্যাদি। শুধু তাই নয় দেখতেও যেন গাড়িটি সুন্দর হয় সেজন্য কোথাও রং খারাপ হোয়ে গেলে কেমন রং কেমন ভাবে লাগালে গাড়ি সুন্দর দেখাবে তাও সব কিছু আছে। ঐ Maintenance বইয়ে এত সব কিছু লেখা থাকলেও **মূল সত্য হোচ্ছে এই যে ঐ গাড়ি তৈরীর উদ্দেশ্য যে ওটা আপনাকে আপনার প্রয়োজনীয় গন্তব্যস্থানে নিয়ে যাবে।** বাকি সব ঐ উদ্দেশ্যের পরিপূরক। এখন আপনি যদি না জানেন ঐ গাড়িটি দিয়ে কি হয়, ওটাকে কি উদ্দেশ্যে তৈরী করা হোয়েছে তবে আপনাকে ঐ গাড়িটি উপহার দেয়া নিষ্ফল, অর্থহীন। ঐ গাড়িটির উদ্দেশ্য আপনাকে প্রয়োজন মোতাবেক ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রংপুর নিয়ে যাওয়া। আপনি যদি সেটাই না বোঝেন তবে আপনি কি কোরবেন? আরামের গদি দেখে ভাববেন এই গাড়িটিকে তৈরী করার উদ্দেশ্য হোচ্ছে এই গদিতে বসে আরাম করার জন্য। কিম্বা ভাববেন এটা তৈরীর উদ্দেশ্য হোচ্ছে রেডিও শোনার জন্য, ক্যাসেটে সঙ্গীত শোনার জন্য। আর তাই মনে কোরে আপনি গাড়িটির আরামের সিটে বসে রেডিও, ক্যাসেট বাজাবেন।

এই হোলে আপনার আকীদার ভুল হোল। আপনাকে গাড়িটি উপহার দেয়া অর্থহীন হোল কারণ ওটার আসল উদ্দেশ্যই আপনি বুঝলেন না। আপনি যদি গাড়ির Maintenance বই দেখে দেখে অতি সতর্কতার সাথে যথাস্থানে চর্বি লাগান, মবিল দেন, চাকায় পাম্প দেন, গাড়ির ট্যাংকে তেল দেন, গাড়ির রং পালিশ করেন, তবুও সবই অর্থহীন যদি আপনি না জানেন যে গাড়িটির আসল উদ্দেশ্য কি। অর্থহীনতা ছাড়াও আরও একটি ব্যাপার হবে। সেটা হোল **আপনার অগ্রাধিকারের (Priority) ধারণাও ভুল হোয়ে যাবে।** তখন আপনার কাছে গাড়ির ইঞ্জিনের চেয়েও প্রয়োজনীয় ব্যাপার হোয়ে দাঁড়াবে গাড়ির রেডিও, ক্যাসেট, গাড়ির রং ইত্যাদি। অর্থাৎ অগ্রাধিকার ওলট-পালট হোয়ে গিয়ে অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপার হোয়ে যাবে অতি সামান্য বা একেবারে বাদ যাবে আর অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার হোয়ে দাঁড়াবে মহা প্রয়োজনীয়। এ জন্যই সমস্ত

আলেম, ফকিহ, এমামরা একমত হোয়েই বোলেছেন যে আকীদা অর্থাৎ কোন ব্যাপার বা জিনিস সম্বন্ধে পূর্ণ ধারণা না হোলে বা ওটার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভুল ধারণা হোলে সম্পুর্ণ জিনিসটাই অর্থহীন- ঈমান এবং অন্যান্য এবাদতও অর্থহীন।

আল্লাহ আমাদের এসলাম বোলে যে দীন, জীবন-বিধান দিয়েছেন সেটার উদ্দেশ্য কী, সেই আকীদা আমাদের বহু পূর্বেই বিকৃতি হোয়ে ঐ গাড়ির মালিকের মত হোয়ে গেছে- যে গাড়ির উদ্দেশ্যই জানে না। ঐ মালিকের মত আমরা Maintenance বই, অর্থাৎ কোর'আন-হাদীস দেখে দেখে অতি সতর্কতার সাথে গাড়ির পরিচর্য্যা কোরছি- কিন্তু ওটাতে চড়ি না, ওটা চালিয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় গন্তব্যস্থানে যাই না, গ্যারেজে রেখে দিয়েছি- কারণ ওটার আসল উদ্দেশ্যই আমরা জানি না বা যেটা মনে কোরি তা ভুল বা বিকৃত। কাজেই আমাদের অগ্রাধিকারও (Priority) ওলট-পালট হোয়ে গেছে। প্রকৃত উদ্দেশ্যই অর্থাৎ তওহীদ ও তা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আমরা ত্যাগ কোরেছি, কিন্তু গাড়ির রং, পালিশ, অর্থাৎ দাড়ি, টুপি, পাগড়ী, আলখাল্লা সম্বন্ধে আমরা অতি সতর্ক। **আকীদার বিকৃতি ও তার ফলে অগ্রাধিকারের ওলট-পালটের পরিণাম এই হোয়েছে যে আল্লাহ আমাদের ত্যাগ কোরেছেন, আমরা তাঁর গযবের ও লানতের পাত্রে পরিণত হোয়েছি।** আমরা আজ পৃথিবীর নিকৃষ্টতম জাতিতে পরিণত হোয়েছি। অন্য সমস্ত জাতি, পৃথিবীর সর্বত্র আমাদের গণহত্যা কোরছে, আমাদের বাড়ি ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, আমাদের পর্দানশিন মা-বোনদের উলংগ কোরে ধর্ষণ করে গর্ভবতী কোরছে, হাজারে হাজারে আমাদের মসজিদ ধ্বংস কোরে দিচ্ছে।

বর্ত্তমানে আকীদা ও ঈমানকে একই জিনিস বোলে মনে করা হয়। এই ধারণা ভুল। প্রথমতঃ ঈমান শব্দের অর্থ হোল বিশ্বাস আর আকীদা শব্দটি এসেছে আক্দ শব্দ থেকে যার মানে গ্রন্থি, গিঁঠ বা গেরো। আমরা এই শব্দটি বিয়েতে ব্যবহার কোরি। আক্দ করানো অর্থ বিয়ে করানো, দু'টি মানুষকে গিঁঠ বা গেরো দিয়ে দেওয়া। ঐ আক্দ থেকে আকীদা। অর্থাৎ ঈমান ও আকীদা দু'টি সম্পুর্ণ আলাদা শব্দ এবং সম্পুর্ণ আলাদা অর্থ। দ্বিতীয়তঃ আকীদা ভুল হোলে ঈমান অর্থহীন- এ কথাতেই তো পরিষ্কার হয় যে ঐ দু'টো এক জিনিস নয়। একটা ভুল হোলে অন্যটি অর্থহীন অর্থাৎ এক নম্বর ভুল হোলে দুই নম্বর অর্থহীন- কাজেই এ দু'টো বিষয় একই বিষয় হওয়া অসম্ভব। অথচ এই ভুল ধারণা আজ সর্বব্যাপী। এটা হোয়েছে এই জন্য যে এসলামের প্রকৃত আকীদা

আজ অদৃশ্য হোয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে, তাই ওটাকে ঈমানের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হোয়েছে- যদিও এ দু'টো সম্পুর্ণ আলাদা ব্যাপার।

এই দীনের সঠিক আকীদা এ রকম:

১। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাঁর এই বিরাট বিশাল মখলুক সৃষ্টি কোরলেন এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের ও পরিচালনার জন্য অসংখ্য মালায়েক বা ফেরেশতা সৃষ্টি কোরলেন। এই সৃষ্টির (মখলুকের) বা ঐ মালায়েকদের কোন স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ছিলো নাএবং নেই। যাকে যে কাজের জন্য আল্লাহ সৃষ্টি কোরলেন বা যে কাজের দায়িত্ব দিলেন তারা নিখুঁতভাবে সেই কাজ কোরে চললো, যার সামান্যতম বিচ্যুতি নেই।

২। আল্লাহর ইচ্ছা হোল এমন এক সৃষ্টি কোরতে যে সৃষ্টির স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি থাকবে, যে ইচ্ছা কোরলে আল্লাহর দেয়া নিয়ম ও দায়িত্ব মোতাবেক চোলবে, ইচ্ছা কোরলে তা অমান্য কোরতে পারবে।

৩। তাই আল্লাহ আদম অর্থাৎ মানুষ সৃষ্টি কোরলেন। আদমের মধ্যে আল্লাহ তাঁর নিজের আত্মা (রূহ্) থেকে ফুঁকে দিলেন (সুরা হেজর ২৯) অর্থাৎ আদমের মধ্যে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি, যা আল্লাহ ছাড়া আর কারও নেই, তা এবং আল্লাহর অন্যান্য সকল সিফত্ বা গুণ প্রবেশ কোরিয়ে দিলেন। কাজেই এই নতুন অসাধারণ সৃষ্টির নাম দিলেন আল্লাহর খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধি।

৪। একটা বিরুদ্ধশক্তি না থাকলে কোন পরীক্ষা (Test) সম্ভব নয় তাই এবলিস বা শয়তানকে এই খলিফার বিরুদ্ধে দাড় করালেন এবং ঐ পরীক্ষার জন্য এবলিসকে মানুষের দেহ মনের মধ্যে প্রবেশ ও তাকে প্রভাবিত করার অনুমতি ও শক্তি দিলেন (সুরা বাকারা ৩০) ।

৫। **এবলিস আল্লাহকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহবান (Challenge) কোরলো** এই বোলে যে তোমার এই খলিফাকে আমি ফাসাদ অর্থাৎ অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার এবং সাফাকুদ্দিমা অর্থাৎ যুদ্ধ-বিগ্রহ রক্তপাতের মধ্যে পতিত কোরবো। আল্লাহ এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে গ্রহণ কোরে বোললেন- আমি আমার প্রেরিত নবী-রসুলদের এবং হাদীদের মাধ্যমে আমার খলিফা মানুষদের জন্য এমন জীবন-ব্যবস্থা, দীন পাঠাব যে জীবন ব্যবস্থা অনুযায়ী ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক,

রাষ্ট্রীয় অর্থাৎ সমষ্টিগত জীবন পরিচালিত কোরলে তারা ঐ ফাসাদ এবং সাফাকুদ্দিমায় পতিত হবে না, অর্থাৎ ন্যায় বিচার ও শান্তিতে (এসলাম শব্দের আক্ষরিক অর্থই শান্তি) পৃথিবীতে বাস কোরতে পারবে। এখানে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, এবলিস আল্লাহকে এ চ্যালেঞ্জ দিলো নাযে তোমার খলিফা, প্রতিনিধিকে আমি মসজিদে, গির্জায়, মন্দিরে, সিনাগগে, প্যাগোডায় যেতে বাধা দেব, তাদের হজ্ব কোরতে, রোযা রাখতে, যাকাত দিতে, দান-খয়রাত কোরতে বা অন্য যে কোন পুণ্য কাজে, সওয়াবের কাজে বাধা দেব। সে এই চ্যালেঞ্জ দিলো যে মানুষকে সে ফাসাদ এবং সাফাকুদ্দিমায় পতিত কোরবে। অন্যায়, অবিচার, অশান্তি এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ রক্তপাত, এ **দু'টোই সমষ্টিগত ব্যাপার এবং ঠিক এ দু'টোই মানুষ সৃষ্টির প্রথম থেকে আজ পর্য্যন্ত মানব জাতির সর্বপ্রধান সমস্যা হোয়ে আছে যার সমাধান আজ পর্য্যন্ত করা যায় নি।**

৬। মানুষ জাতিকে তাঁর দেয়া জীবন-বিধান পাঠিয়ে আল্লাহ মানুষকে বোললেন- এবলিস, শয়তান আমাকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছে যে সে তোমাদের দিয়ে আমাকে অস্বীকার করাবে, অর্থাৎ আমার পাঠানো জীবন-ব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে তোমাদের নিজেদের দিয়ে জীবন-ব্যবস্থা তৈরী কোরিয়ে সেই মত তোমাদের সমষ্টিগত, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় জীবন পরিচালিত করাবে, যার ফলে তোমরা সেই ফাসাদ এবং সাফাকুদ্দিমায় পতিত হবে। তোমরা এবলিসের প্ররোচনায় না পোড়ে আমাকে একমাত্র জীবন-বিধাতা বোলে গ্রহণ করো অর্থাৎ নবী-রসুলদের মাধ্যমে আমি যে জীবন-বিধান পাঠিয়েছি তা গ্রহণ ও সামগ্রিক জীবনে প্রয়োগ করো, তাহোলে তোমাদের জীবন থেকে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সমস্ত অন্যায়-অবিচার চোলে যাবে এবং তোমাদের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ, রক্তপাত হবে না অর্থাৎ তোমরা পূর্ণ শান্তিতে (এসলামে) বাস কোরতে পারবে। আমি সর্বশক্তিমান- আমি ইচ্ছা কোরলেই সমস্ত মানবজাতি এবলিসকে অস্বীকার কোরে আমার পাঠানো দীনকে গ্রহণ কোরে শান্তিতে বাস কোরবে (কোর'আন- সুরা আনআম- ৩৫, সুরা ইউনুস- ১০০)। কিন্তু আমি তা কোরবো না কারণ আমার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আমি তোমাদের দিয়েছি পরীক্ষা করার জন্য যে তোমরা কি করো (কোরান- সুরা মোহাম্মদ- ৪)। তোমরা শয়তানের প্ররোচনায় পতিত না হোয়ে আমাকে একমাত্র জীবন-বিধাতা বোলে গ্রহণ কোরলে তার ফলস্বরূপ এ পৃথিবীতে যেমন শান্তিতে (এসলামে) বাস কোরবে, তেমনি পরজীবনেও আমি তোমাদের জান্নাতে স্থান দেবো। তোমাদের ব্যক্তিগত সমস্ত গোনাহ আমি মাফ কোরে দেবো কারণ তাহোলে এবলিসের চ্যালেঞ্জে তোমরা আমাকে জয়ী করালে। আর যদি শয়তানের প্ররোচনায়

আমার দেওয়া জীবন-বিধানকে অস্বীকার কোরে নিজেরা জীবন-ব্যবস্থা তৈরী কোরে নাও তবে তার ফলস্বরূপ তোমরা সর্বপ্রকার অন্যায় অবিচার আর রক্তপাতে ডুবে তো থাকবেই তার ওপর মৃত্যুর পর পরজীবনে আমি তোমাদের জাহান্নামের কঠিন শাস্তির মধ্যে পতিত কোরবো। তোমাদের ব্যক্তিগত লক্ষ কোটি সওয়াব পুণ্যের দিকে আমি চেয়েও দেখবো না। কারণ তাহোলে এবলিসের চ্যালেঞ্জে তোমরা আমাকে পরাজিত কোরে দিলে। এটা আমার প্রতিশ্রুতি।

৭। তাহোলে দেখা যাচ্ছে **মানব জাতির সম্মুখে মাত্র দু'টি পথ।** একটি হোচ্ছে নবী-রসুলদের মাধ্যমে পাঠানো জীবন-ব্যবস্থা গ্রহণ করা, অর্থাৎ আল্লাহকে একমাত্র এলাহ বোলে স্বীকার করা, অন্যটি হোচ্ছে ঐ জীবন-বিধান প্রত্যাখ্যান কোরে নিজেরা জীবন-ব্যবস্থা তৈরী কোরে তাই মেনে চলা। **মানবজাতিকে এই দুই পথের একটাকে গ্রহণ কোরতে হবে, তৃতীয় কোন পথ নেই।** আল্লাহ বোললেন, যে বা যারা প্রথমটি গ্রহণ কোরবে এবং তা থেকে বিচ্যুত হবে না তাদের কোন ব্যক্তিগত গোনাহ, পাপ তিনি দেখবেন না, তাদের জান্নাতে স্থান দেবেন। আর যে বা যারা নবী-রসুলদের মাধ্যমে পাঠানো জীবন-বিধান অস্বীকার কোরে নিজেরা জীবন ব্যবস্থা তৈরী কোরে নেবে তাদের ব্যক্তিগত কোন সওয়াব, পুন্য তিনি গ্রহণ কোরবেন না, তাদের জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। এই যে সমষ্টিগতভাবে জীবন বিধানকে গ্রহণ ও প্রত্যাখ্যানের প্রশ্নে ব্যক্তিগত জীবনকে দাম না দেয়া, এর কারণ হোচ্ছে, সমষ্টিগতভাবে আল্লাহর দেয়া জীবন বিধান কার্য্যকর কোরলে সমাজ থেকে সবরকম অন্যায়-অবিচার, দুঃখ, যুদ্ধ ও রক্তপাত বিলুপ্ত হোয়ে যাবে এবং ব্যক্তিগত অন্যায় প্রায় লোপ পাবে। আর মানুষের নিজের তৈরী জীবন-ব্যবস্থা চালু কোরলে, ব্যক্তিগতভাবে মানুষ যতো ভালো থাকার চেষ্টা করুক না কেন সমাজ সব রকম অন্যায়, অবিচার, অশান্তি ও রক্তপাতের মধ্যে পতিত হবে। উদাহরণ- বর্ত্তমান সময়।

৮। আল্লাহকে একমাত্র এলাহ অর্থাৎ আদেশদাতা বোলে গ্রহণ করা অর্থ জীবনের প্রতি বিভাগে, প্রতি স্তরে অর্থাৎ ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি ইত্যাদি প্রত্যেক অঙ্গনে গ্রহণ করা। এটাই হোল তওহীদ, সেরাতুল মুস্তাকীম, দীনুল কাইয়েমা। যে বা যারা এর উপর অনড় থাকবে, বিচ্যুত হবে না, তার এবং তাদের ব্যক্তিগত সমস্ত গোনাহ মাফ কোরে আল্লাহ তাঁর জন্য জান্নাত নিশ্চিত কোরে দিয়েছেন।

বিশ্বনবী এ কথাটি পরিষ্কার কোরে দিয়েছেন এই বোলে যে, আল্লাহর সাথে তাঁর বান্দার চুক্তি (Contract) এই যে, বান্দা তাঁর পক্ষ থেকে যদি এই শর্ত্ত পালন করে যে, সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে এলাহ অর্থাৎ বিধাতা বোলে স্বীকার কোরবে না- তবে আল্লাহও তাঁর পক্ষ থেকে এই শর্ত্ত পালন কোরবেন যে, তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন [হাদীস- মুয়ায (রাঃ) থেকে বোখারী, মোসলেম মেশকাত]। এখানে অন্য কোন কাজের শর্ত্ত নেই। এই একটি শর্ত্ত পালন কোরলে আর কোন গোনাহই তাকে জান্নাত থেকে ফেরাতে পারবে না; এমনকি মহানবীর উল্লেখিত ব্যভিচার ও চুরির মত কবীরা গোনাহও না। একদিকে যেমন আল্লাহ তাঁর সৃষ্ট বান্দার সঙ্গে এই চুক্তি কোরছেন, তেমনি এ কথাও পরিষ্কার কোরে বোলে দিচ্ছেন যে, জীবনের যে কোন অঙ্গনে, যে কোন বিভাগে তাঁর আইন অস্বীকার কোরলে অর্থাৎ শেক কোরলে তিনি তা ক্ষমা কোরবেন না, লক্ষ লক্ষ সওয়াবের কাজ কোরলেও না, সারারাত্র তাহাজ্জুদ নামায পোড়লেও না, সারা বছর রোযা কোরলেও না (কোর'আন- সুরা নেসা ৪৮, ১১৬)।

৯। আল্লাহ তাঁর নবী-রসুলদের মাধ্যমে যুগে যুগে পৃথিবীর প্রতি স্থানে, প্রতি জনপদে তাঁর সৃষ্ট জীবন-বিধান অর্থাৎ দীন পাঠিয়ে দিলেন এবং মানব জাতি যখন উপযুক্ত হোল তখন সমস্ত পৃথিবী ও মানব জাতির জন্য জীবন-বিধানের শেষ সংস্করণ দিয়ে তাঁর শেষ রসুল মুহাম্মদ (দঃ) কে পাঠালেন। এখন কথা হোচ্ছে বিধান, **সংবিধান, দীন শুধু পাঠালেই কি কাজ শেষ হোয়ে গেল?** অবশ্যই নয়, কারণ এটা যদি গৃহীত না হয়, শয়তানের প্ররোচনায় যদি ঐ দীন প্রত্যাখ্যাত হয়, যদি তা প্রয়োগ ও কার্য্যকর না করা হয় তবে ঐ দীন পৃথিবীতে আসা না আসা সমান কথা। তাই আল্লাহ ওটাকে প্রয়োগ ও কার্য্যকর করারও বন্দোবস্ত কোরলেন। দীনকে প্রয়োগ ও প্রতিষ্ঠা করার উপায়, পদ্ধতি তিনি স্থির কোরলেন জেহাদ ও কেতাল- অর্থাৎ সংগ্রাম ও সশস্ত্র সংগ্রাম (সুরা বাকারা-২১৬)। **অর্থাৎ জেহাদকে তিনি নীতি হিসাবে নির্দিষ্ট কোরলেন। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, অর্থাৎ সর্বব্যাপী তওহীদ ও ঐ তওহীদ ভিত্তিক দীন, জীবন-ব্যবস্থা মানবজীবনে সমষ্টিগত ও ব্যক্তিগতভাবে প্রতিষ্ঠা- এই দুই হোল এই দীনের মূলমন্ত্র।** এবং মূলমন্ত্র বোলেই তওহীদে যিনি অবিচল তার মহাপাপও (গুনাহে কবীরা) হিসাবে ধরা হবে না এবং জেহাদে যিনি প্রাণ দিয়েছেন তার তো কথাই নেই, যিনি জেহাদের অভিযানে বের হোয়ে অর্দ্ধেক রাত্রি শিবির পাহারা দিয়েছেন তারও সারা জীবনের মহাপাপ ও কোন সওয়াবের কাজ না করাকেও উপেক্ষা কোরে তাকে সরাসরি জান্নাতে স্থান দেয়া হবে [হাদীস- ইবনে আ'য়েয (রাঃ)

থেকে- বায়হাকী, মেশকাত]। এই দুই মূলমন্ত্র বাদে এ দীনে আর যা আছে সব এই দুই-এর পরিপূরক। **এই দুই মূলমন্ত্র যদি মূলমন্ত্র, মূলনীতি হিসাবে না থাকে তবে বাকি আর যা কিছু আছে সবই বৃথা, অর্থহীন।** এই জন্যই যার মাধ্যমে এই দীন পৃথিবীতে এসেছে সেই বিশ্বনবী বোলেছেন- ভবিষ্যতে এমন সময় আসবে যখন মানুষের রোযা রাখা হবে না খেয়ে থাকা, উপবাস হবে, রোযা হবে না; আর গভীর রাত্রে উঠে তাহাজ্জুদ নামায পড়া ঘুম নষ্ট করা হবে, নামায হবে না [হাদীস- মেশকাত]।

১০। নামায ঐ জেহাদের জন্য চরিত্র সৃষ্টির অনুশীলন (Training, Practice)। সংগ্রামের মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীতে এই জীবন-বিধানকে প্রতিষ্ঠা কোরতে যে অসাধারণ চরিত্রের মানুষ প্রয়োজন, সেই অসাধারণ মানুষের শারীরিক, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক গঠনের জন্য প্রশিক্ষণ হোল নামায। কিন্তু উদ্দেশ্য হোল সেই সংগ্রাম। একটি বাসস্থানের সবচেয়ে জরুরী, সবচেয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসটি হোল ছাদ। ওটা না থাকলে বাসস্থান অর্থহীন। সোনা, হীরা-জহরত দিয়ে তৈরী কোরলেও ওটা অর্থহীন, ওতে বাস করা যাবে না; এবং ঐ ছাদকে ওপরে ধরে রাখার জন্য থাম বা খুঁটি ছাড়াও চোলবে না। তাই আল্লাহর রসুল বোলেছেন- এসলাম (অর্থাৎ দীন) একটি ঘর, নামায তার থাম, খুঁটি, আর জেহাদ তার ছাদ [হাদীস- মু'য়ায (রাঃ) থেকে আহমদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, মেশকাত]। **ছাদ না থাকলে যেমন থামের কোনও দাম নেই, প্রয়োজন নেই, তেমনি জেহাদ, সংগ্রাম না থাকলে নামাযেরও কোন দাম নেই।**

১১। কোন মহৎ বিরাট উদ্দেশ্য অর্জন কোরতে গেলে চারটি বিষয় অপরিহার্য্য। জেহাদ অর্থাৎ সংগ্রামের মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীতে দীন প্রতিষ্ঠার মত বিরাট বিশাল কাজে সফলকাম হোতে গেলে ঐ চারটির যে কোন একটিতে ব্যর্থতা বা ত্রুটি হোলেই আর সে কাজে সফলতা আসবে না। সে কয়টি হোচ্ছে-

(ক) উদ্দেশ্য, লক্ষ্য সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা অর্থাৎ আকীদা। এ লক্ষ্য থেকে যদি বিচ্যুতি আসে বা ঐ লক্ষ্য সামনে থেকে অদৃশ্য হোয়ে যায়, হারিয়ে যায় বা বিকৃত হোয়ে যায় তবে ঐখানেই সব শেষ হোয়ে গেলো।

(খ) ঐক্য:- ঐক্যই শক্তি। যদি ঐক্য না থাকে তবে পরাজয়, ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী। তাই আল্লাহ তাঁর কোর'আনে ঐক্য সম্বন্ধে বার বার সাবধান কোরে দিয়েছেন। মতভেদ হোচ্ছে ঐক্যভঙ্গের প্রথম সোপান, তাই মহানবী মতভেদকে কুফর বোলে আখ্যায়িত কোরেছেন- এমন কি কোর'আনের আয়াতের অর্থ নিয়ে মতভেদ ও তর্ককে কুফর বোলেছেন এবং সমাধান হিসেবে বোলেছেন- মতভেদের কোন প্রশ্ন উঠলেই চুপ হোয়ে যাবে এবং ঐ প্রশ্ন আল্লাহর হাতে ছেড়ে দেবে [হাদীস- আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) থেকে মোসলেম, মেশকাত]। নিজেদের মধ্যে মারামারি অর্থাৎ অনৈক্যকে তিনি পরিষ্কার ভাষায় কুফর বোলে আখ্যায়িত কোরেছেন (বিদায় হজ্বের ভাষণ)।

(গ) প্রশিক্ষণ:- উদ্দেশ্য (ক) ও ঐক্য (খ) সুদৃঢ় হোলেও লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে না যদি জাতির যোদ্ধাদের চরিত্র ঐ মহাকঠিন লক্ষ্য অর্জনের জন্য যথেষ্ট না হয়। সেই মহান চরিত্র গঠনের প্রশিক্ষণ হোচ্ছে নামায। দিনে পাঁচবার ঐক্যের, সময়নিষ্ঠতার (Punctuality), নিয়মানুবর্ত্তিতার, শৃংখলার ও বহু রকমের চারিত্রিক, শারীরিক ও আধ্যাত্মিক গঠনের প্রশিক্ষণ। এ প্রশিক্ষণের আকিদা (উদ্দেশ্য) হোচ্ছে সর্বাত্মক সংগ্রাম কোরে তওহীদকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা কোরে এবলিসের চ্যালেঞ্জে আল্লাহকে জয়ী করানো। এ উদ্দেশ্য ভুলে যেয়ে **যদি শুধু প্রশিক্ষণই নেয়া হয় বা প্রশিক্ষণকেই উদ্দেশ্য হিসাবে নেয়া হয় তবে তা সম্পুর্ণ অর্থহীন।**

(ঘ) দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি না করা। যেখানে মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই হোচ্ছে দীনকে মানব জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা, সেখানে সেই প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ছেড়ে দিয়ে খুঁটিনাটি জিনিস নিয়ে ব্যস্ত হোয়ে পোড়লে সবই বরবাদ হোয়ে গেল। এই জন্যই দীনের খুঁটিনাটি ব্যাপারে বিশ্বনবীকে প্রশ্ন কোরলে তিনি রেগে আগুন হোয়ে যেতেন। যেখানে প্রকৃত তওহীদ ও সংগ্রামই কোন মানুষকে বিনা বিচারে জান্নাতে নিয়ে যাবার জন্য যথেষ্ট- সেখানে সেই প্রকৃত তওহীদ ও সংগ্রাম বাদ দিয়ে হাজারো খুঁটিনাটি কাজের সওয়াব কামানোর চেষ্টা সম্পুর্ণ নিরর্থক। সওয়াব কামানোর যতো কিছু এই দীনে আছে সে সবকিছুরই পূর্বশর্ত্ত (Precondition) হোচ্ছে প্রকৃত তওহীদ-ঐ প্রকৃত তওহীদকে বাদ দিয়ে অর্থাৎ ওটাকে ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে, লক্ষ সওয়াবের কাজ এক ফোটাও সওয়াব লেখাবে না। **ঐ প্রকৃত তওহীদ আজ পৃথিবীর কোথাও নেই।** দীনের খুঁটিনাটি মসলা-মাসায়েলে জড়িয়ে পোড়লে মানুষ ঐ সহজ-সরল মূল তওহীদ অর্থাৎ সেরাতুল মুস্তাকীম থেকে বিচ্ছিন্ন হোয়ে যায়।

তাই মহানবী অতি প্রয়োজনীয় মূল সংক্রান্ত প্রশ্ন ছাড়া তাকে অতিরিক্ত কোন প্রশ্ন কোরলেই অত্যন্ত রেগে যেতেন, বোলতেন- আমি তোমাদের যতোটুকু কোরতে বোলেছি ততটুকু কোরতে চেষ্টা করো, তার বেশী আমাকে প্রশ্ন কোর না। তোমাদের পূর্ববর্ত্তী নবীদেরও তাদের উম্মাহর লোকজন এই রকম খুঁটিনাটি মসলা-মাসায়েল নিয়ে প্রশ্ন কোরতো এবং তারপর তাই নিয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হোয়ে তারা ধ্বংস হোয়ে গেছে (হাদীস)। আমরা আমাদের নবীর সতর্কবাণী শুনি নি, তাঁর রাগেরও তোয়াক্কা কোরি নি। আমরা মূল লক্ষ্য ছেড়ে দিয়ে দীনের মসলা-মাসায়েলের এমন চুলচেরা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ কোরেছি যে পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোন জাতি তা কোরতে পারে নি। পরিণামও তাই হোয়েছে যা আমাদের নবী ভয় কোরেছিলেন - আমরা বাহাত্তর ফেরকায় বিচ্ছিন্ন হোয়ে ধ্বংস হোয়ে গেছি।

১২। ব্যক্তি ও সমষ্টি:- আল্লাহর খলিফা মানুষ তৈরীর বিপক্ষে মালায়েকেরা অর্থাৎ ফেরেশতারা যে যুক্তি দেখিয়েছিলো তা হোল এই যে- হে আল্লাহ তোমার এই সৃষ্টি, এই খলিফা পৃথিবীতে ফাসাদ (অন্যায়, অবিচার, অশান্তি) ও সাফাকুদ্দিমা (মারামারি, রক্তপাত, যুদ্ধ-বিগ্রহ) কোরবে। **মালায়েকেরা যে দুটি শব্দ ব্যবহার কোরলো সে দু'টোই সমষ্টিগত, ব্যক্তিগত নয়। অর্থাৎ মূল প্রশ্ন, মূল সমস্যাই সমষ্টিগত।** এ মূল সমস্যার সমাধান আল্লাহ দিলেন- দীনুল এসলাম, এটাও সমষ্টিগত। ব্যক্তির স্থান এখানে নগণ্য। ব্যক্তির মূল্য শুধু এটুকুই যে ব্যক্তি দিয়েই সমাজ, জাতি গঠিত, ব্যক্তি জাতির একটি একক (unit), এর বেশী নয়। **সমষ্টির এই একক হিসাবে ব্যক্তির যেমন মূল্য আছে, তেমনি সমষ্টির বাইরে এর কোন দাম নেই।** উদাহরণ হিসাবে একটি সামরিক বাহিনীকে নেয়া যায়। একটি একটি সৈনিক নিয়েই বাহিনীটি গঠিত। ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি সৈন্য যতো ভালো যোদ্ধা হবে, বাহিনীর জন্য তত ভালো। সেনাপতি চেষ্টা কোরবেন যাতে তার বাহিনীর প্রতিটি সৈনিক দক্ষ যোদ্ধা হয়, যদি তিনি দেখেন যে কয়েকটি সৈনিক তেমন ভালো কোরছে নাতবে স্বভাবতই তিনি তাদের প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেবেন, তাদের শিক্ষার ওপর বিশেষ চাপ দেবেন। এমনকি যদি তিনি একটি মাত্র সৈন্যকেও দেখেন যে তার রাইফেলের গুলি লক্ষ্যস্থলে লাগছে না, তাহোলে তাকে আরো ভালো কোরে শেখাবেন কেমন কোরে গুলি কোরলে লক্ষ্যস্থলে লাগবে, অভ্যাস করার জন্য আরও গুলি সরবরাহ কোরবেন। কিন্তু ঐ বাহিনীর বাইরে ঐ একক সৈন্যের কোন মূল্য নেই। ঐ সামরিক বাহিনী যদি ঐক্যবদ্ধ,

শৃংখলাবদ্ধ হোয়ে, সেনাপতির পরিকল্পনা অনুযায়ী যুদ্ধ না কোরে সৈন্যরা এককভাবে যুদ্ধ শুরু করে তবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই ঐ বাহিনী শত্রুর আক্রমণের সম্মুখে অবশ্যই ধ্বংস হোয়ে যাবে। প্রতিটি সৈন্য যদি অতি দক্ষ যোদ্ধাও হয় তবুও তাই হবে।

সুতরাং এ দীনেও ব্যক্তির মূল্য ঐ সেনাবাহিনীর একটি সৈনিকের চেয়ে বেশী নয়। যে পাঁচটি স্তম্ভের (ফরদে আইন) ওপর এই দীন স্থাপিত তার চারটিই সমষ্টিগত, জাতিগত। **তওহীদ, (ফরদ) নামায, যাকাত, হজ্ব এই চারটিই সমষ্টিগত, জাতিগত; শুধুমাত্র রোযা ব্যক্তিগত।** বর্ত্তমানে বিকৃত, বিপরীতমুখী যে দীন আমরা মেনে চোলেছি তাতে তওহীদকে সমষ্টিগতভাবে বুঝা অনেকের পক্ষে অসুবিধাকর হোতে পারে। তাদের বুঝার জন্য সংক্ষেপে বোলছি- আল্লাহ যে তওহীদকে স্বীকৃতি দেবেন, গ্রহণ কোরবেন, সে তওহীদ সর্বব্যাপী, মানুষের জীবনের সর্বস্তরের সমস্ত অঙ্গনের তওহীদ, তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, আইন, দণ্ডবিধি, শিক্ষা, অর্থনীতি ইত্যাদি সমস্ত কিছুর উপর তওহীদ; অর্থাৎ সমষ্টিগত তওহীদ। জীবনের ক্ষুদ্রতম কোন বিষয়ও তা থেকে বাদ থাকবে না। এর নিচে কোন তওহীদ সেই সর্বশক্তিমান স্রষ্টা গ্রহণ কোরবেন না। বর্ত্তমানে আমাদের তওহীদ জীবনের শুধু ব্যক্তিগত ভাগে ছাড়া আর কোথাও নেই। এই আংশিক ও ক্ষুদ্র তওহীদ আল্লাহর পক্ষে গ্রহণ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। প্রকৃত তওহীদ সমষ্টিগত, জাতিগত। আল্লাহ কোর'আনে বার বার বোলেছেন- আসমান ও যমিনের সার্বভৌমত্ব আল্লাহর। তিনি মানব জাতির ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক জীবন পরিচালনার জন্য যে সংবিধান (কোর'আন) ও ঐ সংবিধানের ওপর ভিত্তি কোরে যে আইন-কানুন, দণ্ডবিধি দিলেন সেটার সার্বভৌমত্ব হোল আল্লাহর। **বৃহত্তর ও সমষ্টিগত জীবনে গায়রুল্লাহর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার ও গ্রহণ কোরে নিয়ে শুধুমাত্র ব্যক্তিজীবনের সার্বভৌমত্বটুকু আমরা আল্লাহর জন্য রেখেছি। সেই জাল্লে-জালাল, আযিজুল জব্বার, স্রষ্টা ভিক্ষুক নন যে তিনি এই ক্ষুদ্র তওহীদ গ্রহণ কোরবেন।** তাছাড়া ওটা তওহীদই নয়, ওটা শের্ক ও কুফর। রাজতন্ত্রের সার্বভৌমত্ব হোচ্ছে রাজার, বাদশাহ্‌র; ফ্যাসিবাদের সার্বভৌমত্ব হোচ্ছে ডিক্টেটরের অর্থাৎ একনায়কের; সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের সার্বভৌমত্ব হোচ্ছে সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীর ডিক্টেটরশিপ; গণতন্ত্রের সার্বভৌমত্ব হোচ্ছে জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠতার; আর এই দীনুল এসলামের সার্বভৌমত্ব হোচ্ছে- স্বয়ং আল্লাহর, এতে কোথাও কোন আপোষের স্থান নেই। একথা

যার ঈমান নয়, সে মোসলেমও নয়, মো'মেনও নয় উম্মতে মোহাম্মদী তো দুরের কথা। তারা সারা বছর রোযা রাখলেও, সারারাত্রি নামায পোড়লেও নয়। এই তওহীদই হোচ্ছে সেরাতুল মুস্তাকীম- সহজ, সরল সোজা পথ। মরুভুমির বালির ওপর সোজা একটি লাইন টেনে বিশ্বনবী বোললেন- এই হোচ্ছে সেরাতুল মুস্তাকীম, তারপর সেই লাইন থেকে ডাইনে, বামে আড়াআড়ি কতকগুলি লাইন টেনে বোললেন- শয়তান এমনি কোরে মানুষকে এই সেরাতুল মুস্তাকীম থেকে বিচ্যুত কোরতে ডাকবে। এই বোলে তিনি কোর'আন থেকে পোড়লেন- (আল্লাহ বোলেছেন) "নিশ্চয়ই এই হোচ্ছে আমার সেরাতুল মুস্তাকীম। কাজেই এই পথে চলো, অন্য পথ অনুসরণ কোরো না; (কোরলে) তা তোমাদের তাঁর এই মহান পথ থেকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কোরে দেবে (সুরা আন'আম ১৫৩)। ঐ সেরাতুল মুস্তাকীম, সহজ-সরল পথ হোচ্ছে প্রকৃত তওহীদ, জীবনের কোন বিভাগে, কোন অঙ্গনে এক আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে মানি না এবং কারো এবাদত কোরি না- এই সহজ সরল কথা। আমরা এই সেরাতুল মুস্তাকীমে গত কয়েকশ' বছর থেকেই নেই। **আমরা যে দীনকে আঁকড়ে ধোরে আছি, যেটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেনে চোলতে চেষ্টা কোরছি সেটা বহু মযহাবে, ফেরকায় বিচ্ছিন্ন একটি অতি জটিল পথ, সেটা আর যাই হোক আল্লাহর দেয়া সেরাতুল মুস্তাকীম, সহজ সরল পথ নয়।** সেরাতুল মুস্তাকিমের সহজ-সরল লাইন থেকে যে আড়াআড়ি লাইনগুলো মহানবী টেনে ছিলেন এবং বোলেছিলেন এগুলো শয়তানের লাইন, আমরা বিভিন্ন মযহাব, ফেরকার ও তরিকার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন লোকেরা সেই লাইনগুলিতে আছি।

তাহোলে দেখা যাচ্ছে- সর্বাত্মক সংগ্রামের মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীতে আল্লাহর তওহীদ প্রতিষ্ঠা করার মত বিরাট, বিশাল ও কঠিন লক্ষ্য অর্জনের জন্য যে চারটি অত্যাবশ্যক শর্ত পেছনে উল্লেখ কোরে এসেছি, আজ আমাদের মধ্যে তার একটিও নেই। প্রথম শর্ত আকীদা শুধু বিকৃত নয়, বর্ত্তমানে আকীদাই নেই, ঈমানকেই আকীদা বোলে নেয়া হোচ্ছে। দ্বিতীয় শর্ত ঐক্যের কথা না বলাই ভালো; প্রায় পঞ্চাশটির মত ভৌগলিক রাষ্ট্র, তেহাত্তরটি মযহাব-ফেরকায়, বহু তরিকায় ও নানানভাবে বিভক্ত ও বিচ্ছিন্ন হোয়ে আছি এবং প্রায়ই নিজেদের মধ্যে মারামারি কোরছি। তৃতীয় শর্ত শৃংখলার তো প্রশ্নই ওঠে না, কারণ যেখানে ঐক্যই নেই সেখানে শৃংখলার অস্তিত্ব কোথা থেকে আসবে? তারপর চতুর্থ শর্ত্ত দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি ব্যাপারে, যে বাড়াবাড়ির চিহ্ন দেখলে আল্লাহর রসুল রেগে লাল হোয়ে যেতেন, বোলতেন- দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি কোরে তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মাহগুলি

ধ্বংস হোয়ে গেছে, **সেই বাড়াবাড়িকে আমরা অতি সওয়াবের কাজ মোনে কোরে দারুণ উৎসাহের সাথে কোরে যাচ্ছি।** চূড়ান্ত তাক্ওয়ার সাথে জাহান্নামের পথে চোলছি আর জান্নাতে স্থান পাব মোনে কোরে আহাম্মকের স্বর্গে বাস কোরছি। একথা বুঝবার মত বোধ শক্তিও আমাদের নেই যে **আজ সমস্ত পৃথিবীতে এবলিস জিতে আছে।** যে ফাসাদ আর সাফাকুদ্দিমার চ্যালেঞ্জ সে আল্লাহকে দিয়েছিলো তা দিয়ে আজ পৃথিবী ভরপুর। আর আল্লাহ যে সুবিচার, ন্যায় ও শান্তির (এসলাম) কথা বোলেছিলেন তা আজ পৃথিবীর কোথাও নেই। যে উম্মাহ, জাতির ওপর আল্লাহকে জয়ী করাবার দায়িত্ব বিশ্বনবী দিয়ে গিয়েছেন, সে জাতি তার ব্যর্থতার বোঝা কাঁধে নিয়ে দাড়ি লম্বা কোরে টুপি পাগড়ী আলখাল্লা পরে মসজিদে দৌঁড়াচ্ছে।

১৩। মো'মেন, মোসলেম ও উম্মতে মোহাম্মদীর মধ্যে তফাৎ:- বর্ত্তমানের বিকৃত এসলামে আমরা ঐ তিনটি বিষয়কে একই বিষয় মনে কোরি। প্রকৃত পক্ষে তা নয়, ঐ তিনটি আলাদা আলাদা বিষয়।

(ক) মো'মেন: শব্দটা এসেছে ঈমান অর্থাৎ বিশ্বাস থেকে। যে বা যারা আল্লাহ আছেন, এবং তিনিই সমস্ত কিছু সৃষ্টি কোরেছেন একথা সন্দেহের লেশমাত্র না কোরে বিশ্বাস কোরে, আল্লাহকে জীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, শিক্ষা ইত্যাদি এক কথায় জীবনের প্রতি বিভাগে, প্রতি অঙ্গনে একমাত্র প্রভু এবং বিধাতা (বিধাতা শব্দের অর্থ বিধানদাতা অর্থাৎ আইনদাতা) বোলে বিশ্বাস করে, জীবনের কোন বিভাগে অন্য কারো কথা মানাকে শের্ক বোলে বিশ্বাস করে, সে বা তারা মো'মেন। যে বা যারা এ বিশ্বাস থেকে একটুও বিচ্যুত হবে না, জীবনের শেষ পর্য্যন্ত এ বিশ্বাসের ওপর অটল থাকবে তাকে আল্লাহ ব্যক্তিগত জীবনের ছোট বড় সমস্ত গোনাহ মাফ কোরে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন বোলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন (বোখারী, মোসলেমসহ বহু হাদীস)। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাঁর কোর'আনে প্রকৃত মো'মেন কে এবং কারা তার পরিষ্কার সংজ্ঞা অর্থাৎ যাকে বলে Definition তা দিয়ে দিয়েছেন। সেটা হোল সুরা হুজরাতের ১৫ নং আয়াত। এখানে আল্লাহ আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন যে **প্রকৃত মো'মেন হোল শুধু তারা যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের ওপর ঈমান আনে, তার পর আর কোনদিন তাতে কোন সন্দেহ করে না** (মৃত্যু পর্য্যন্ত) এবং (এই ঈমান ভিত্তিক দীনকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্য) **নিজেদের প্রাণ ও পার্থিব সম্পদ দিয়ে জেহাদ** (সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, সংগ্রাম)

করে। আল্লাহর দেয়া প্রকৃত মো'মেনের এই সংজ্ঞাটা ঠিক ভাবে বুঝতে গেলে আমাদের বুঝতে হবে "যারা আল্লাহর ওপর ঈমানে"র অর্থ শুধু আল্লাহর অস্তিত্বে ও একত্বের ওপর ঈমান নয়, তাঁর উলুহিয়াতের ওপর ঈমান (লা এলাহা এল্লা আল্লাহ), অর্থাৎ **আল্লাহ ছাড়া কোন আদেশদাতা, হুকুমদাতা নেই এই বিশ্বাস করা অর্থাৎ তওহীদ।** এই সঙ্গে রসুলের কথাও আল্লাহ সংযোগ কোরে দিয়েছেন কারণ রসুল শুধু আল্লাহর কথাই আমাদের জানিয়ে দেন- তিনি নিজে থেকে কোন কথা ইচ্ছামত যোগ করেন না (কোর'আন- সুরা নজম ৩, ৪)। আল্লাহর দেয়া মো'মেনের এই সংজ্ঞার দ্বিতীয় ভাগ হোল প্রাণ ও সম্পদ দিয়ে জেহাদ করা। কি জন্য জেহাদ করা? আল্লাহর তওহীদের, সার্বভৌমত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত দীনটি যদি মানুষের জীবনে প্রতিষ্ঠা, কার্য্যকর না হয় তবে ওটা অর্থহীন। কাজেই আল্লাহর তওহীদ ভিত্তিক ঐ দীনুল হক, সত্য জীবন-ব্যবস্থাটা মানব জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, জেহাদ। **এই দু'টি একত্রে প্রকৃত মো'মেনের সংজ্ঞা।** এই দু'টি যার বা যাদের মধ্যে আছে, আল্লাহর দেয়া সংজ্ঞা মোতাবেক সে বা তারা প্রকৃত মো'মেন। এই সংজ্ঞায় আল্লাহ বলেন নাই যে, যে নামায পড়বে সে মো'মেন, বা যে রোযা রাখবে সে মো'মেন, বা যে হজ্ব কোরবে, বা অন্য যে কোন পূণ্য, সওয়াবের কাজ কোরবে সে মো'মেন। **এ সংজ্ঞায় শুধু আল্লাহ ছাড়া আর সমস্ত রকম প্রভূত্ব অস্বিকার ও আল্লাহর পথে জেহাদ।** এর ঠিক বিপরীতে তিনি এ সতর্কবাণীও বোলেছেন যে এ তওহীদে যে বা যারা থাকবে না, যারা তাদের **ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত জীবনের যে কোন একটি ভাগে, অঙ্গনে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বা নিজেদের তৈরী আইন-কানুন, রীতি-নীতি গ্রহণ বা প্রয়োগ কোরবে তাকে বা তাদের মাফ না করার অঙ্গীকার কোরেছেন** (কোর'আন- সুরা নেসা ৪৮)।

(খ) মোসলেম: শব্দটি এসেছে সালাম থেকে। কোন কিছু সসম্মানে গ্রহণ কোরে নেয়াকে বলা হয় তসলিম কোরে নেয়া। যারা আল্লাহর দেয়া দীনুল এসলামকে সসম্মানে গ্রহণ কোরে নিয়ে নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োগ কোরলো, তারা মোসলেম। **কোন লোক বা জনসমষ্টি আল্লাহকে ও তাঁর দেয়া জীবন-ব্যবস্থাকে সত্যিকার-ভাবে বিশ্বাস না কোরেও মোসলেম হোতে পারে।** সমষ্টিগতভাবে একটি জনসমষ্টি বা জাতি আল্লাহর দেয়া দীনকে তাদের জীবনে প্রয়োগ কোরলে কিছু অবিশ্বাসী লোক সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিরুদ্ধে যাওয়ার অসুবিধা ও বিপদ চিন্তা কোরে প্রকাশ্যে দীনকে তসলিম কোরে নিলে এরা মোসলেম হোলো, কিন্তু মো'মেন হোলো না। এদের

সম্বন্ধেই আল্লাহ কোর'আনে তাঁর রসুলকে বোলেছেন- 'আরবরা বলে- আমরা বিশ্বাস কোরেছি (ঈমান এনেছি)। তাদের বলো- তোমরা বিশ্বাস করো নি বরং বলো আমরা তসলিম কোরেছি (বশ্যতা স্বীকার কোরেছি); কারণ ঈমান তোমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করে নি (কোর'আন- সুরা হুজরাত ১৪)। আল্লাহর কথা যে কত সত্য তা তাঁর রসুলের এন্তেকালের সঙ্গে সঙ্গেই বুঝা গেল। রসুলুল্লাহর এন্তেকালের সময় সমস্ত আরব মোসলেম হোয়ে গিয়েছিলো। অর্থাৎ আল্লাহর আইনের শাসনের অধীনে এসে গিয়েছিলো। মহানবীর ওফাতের সঙ্গে সঙ্গে ঐ মোসলেম আরবের একটা বিরাট অংশ আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কোরেছিলো এটা ইতিহাস। যারা বিদ্রোহ কোরেছিলো তারা মোসলেম হোয়েছিলো, মো'মেন হয় নি। আবু বকরের (রাঃ) নেতৃত্বে ঐ বিদ্রোহের বিরুদ্ধে প্রাণপণ যুদ্ধ কোরে সেদিন যারা এসলামকে রক্ষা কোরেছিলেন, তারা ছিলেন মো'মেন। কোর'আনের বিভিন্ন স্থানে, মো'মেন ও মোসলেমদের আল্লাহ আলাদাভাবে সম্বোধন করা ছাড়াও মো'মেন কারা তা তিনি সুরা হুজরাতের ১৫নং আয়াতে পরিষ্কার কোরে দিয়েছেন যা একটু আগেই উল্লেখ কোরেছি। আল্লাহর দেয়া মো'মেনের সংজ্ঞায় দু'টি শর্ত্ত দেয়া হোলো; **একটি ঈমান, অর্থাৎ তওহীদ, অন্যটি ঐ তওহীদ প্রতিষ্ঠার জেহাদ। বর্ত্তমানে মোসলেম বোলে পরিচিত জাতিটিতে এ দু'টি শর্ত্তের একটিও নেই।** আকীদার বিকৃতিতে আমরা জীবনের সমস্ত অঙ্গন থেকে তওহীদ অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্বকে বাদ দিয়ে শুধু মাত্র ব্যক্তি জীবনে সংকুচিত কোরে রেখেছি- যা প্রকৃতপক্ষে শের্ক। আর জেহাদকে তো উৎখাতই কোরে দিয়েছি এবং তার পরও নিজেদের মো'মেন ও মোসলেম বোলে আত্মপ্রসাদ লাভ কোরছি।

গ) উম্মতে মোহাম্মদী: আল্লাহ এবলিসের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ কোরে একদিকে তাকে তাঁর খলিফা মানবের দেহ-মনের মধ্যে প্রবেশ কোরে তাকে তওহীদ অর্থাৎ সেরাতুল মুস্তাকীম থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টার অনুমতি দিলেন। অন্যদিকে মানবের জন্যে জীবন-ব্যবস্থার, দীন তৈরী কোরে তা তাঁর রসুলদের মাধ্যমে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন এবং তাঁর রসুলদের ওপর আল্লাহ দায়িত্ব অর্পণ কোরলেন তাদের মাধ্যমে পাঠানো দীনকে প্রতিষ্ঠার। কোন রসুলের পক্ষেই এটা সম্ভব ছিলো নাযে তিনি একা একা ঐ বিরাট দায়িত্ব পালন কোরবেন। কাজেই ঐ রসুলদের যারা বিশ্বাস কোরেছে, আল্লাহ প্রেরিত বোলে গ্রহণ কোরেছে তাদের উপর অবশ্য কর্ত্তব্য (ফরদ) হোয়ে গেছে ঐ রসুলদের কাজে সাহায্য করা, রসুলদের উপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব পূর্ণ কোরতে জান-মাল উৎসর্গ করা।

যুগে যুগে এমনি ভাবে বহু রসুল পাঠাবার পর তিনি পাঠালেন তাঁর শেষ রসুল হযরত মুহাম্মদকে (দঃ)। একে পাঠালেন সমস্ত মানব জাতির জন্য এবং পৃথিবীর ও মানুষের বাকী আয়ু কালের জন্য, অর্থাৎ শেষ রসুল হিসাবে। একে পাঠাবার উদ্দেশ্য কি তা তিনি বোলে দিলেন তাঁর কোর'আনে- **তিনি (আল্লাহ) তাঁর রসুলকে হেদায়াত (পথ নির্দেশনা) ও সত্যদীন (জীবন-বিধান) দিয়ে পাঠিয়েছেন এই জন্য যে তিনি এটাকে অন্য সমস্ত দীনের ওপর জয়ী করেন** (কোর'আন- সুরা ফাতাহ ২৮, সুরা তওবা ৩৩, সুরা সফ ৯)। কারণ এই তওহীদ ভিত্তি করা দীনকে জয়ী না কোরতে পারলে পৃথিবীময় অত্যাচার, অবিচার, অশান্তি, যুদ্ধ ও রক্তপাত চোলতেই থাকবে, অর্থাৎ এবলিস জয়ী থাকবে। কি উপায়ে কি প্রক্রিয়ায় এ কাজ কোরতে হবে তাঁর নীতিও আল্লাহ তাঁর নবীকে নির্দিষ্ট কোরে দিলেন- সেটা হোল জেহাদ ও কেতাল, সংগ্রাম ও সশস্ত্র সংগ্রাম। আল্লাহর ঐ নীতি ও নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর রসুল ঘোষণা কোরলেন- আমি (আল্লাহ কর্তৃক) আদিষ্ট হোয়েছি পৃথিবীর মানুষের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম (কেতাল) চালিয়ে যেতে যে পর্য্যন্ত না তারা স্বীকার কোরে নেয় যে আল্লাহ ছাড়া কোন এলাহ নেই ও মোহাম্মদ তাঁর প্রেরিত, নামায পড়ে ও যাকাত দেয় [হাদীস- আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বোখারী]।

এখন প্রশ্ন হোলো- শয়তানের বুদ্ধি-পরামর্শে মানুষের নিজেদের তৈরী প্রচলিত সমস্ত জীবন-ব্যবস্থা, দীনগুলিকে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পরাজিত কোরে সত্যদীনকে প্রতিষ্ঠিত করার মত বিরাট কাজ কি **আল্লাহর রসুলের একার পক্ষে এবং এক জীবনে সম্ভব?** সাধারণ জ্ঞানই একথা বোঝার জন্য যথেষ্ট যে এটা অসম্ভব। তাই আল্লাহর রসুল তাঁর পৃথিবী থেকে চোলে যাবার পরও যাতে ঐ লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রাম চালু থাকে সেজন্য একটি উম্মাহ, একটি জাতি গঠন কোরলেন- যার নাম উম্মতে মোহাম্মদী। তিনি যতোদিন এই পৃথিবীতে রোইলেন ততোদিন তিনি নিজে তাদের ভবিষ্যত কাজের জন্য প্রশিক্ষণ দিলেন। প্রথম দিকের জেহাদগুলিতে নিজে নেতৃত্ব দিলেন এবং পরে নতুন সামরিক নেতৃত্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এক একবার এক এক জন সম্ভাবনাময় সাহাবাকে নেতৃত্ব দিয়ে পাঠাতে লাগলেন। এমনি কোরে মাত্র দশ বছরের মধ্যে আটাত্তরটি যুদ্ধ সংঘটিত কোরে, একটি দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা জাতি গঠন কোরে তিনি তাঁর প্রেরক প্রভুর কাছে চোলে গেলেন। যে অপরাজেয় যোদ্ধা জাতিটি তিনি গঠন কোরে গেলেন সে জাতির আকীদার মধ্যে তিনি সুস্পষ্টভাবে গেঁথে দিয়ে গেলেন যে তাঁর ওপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব-সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে সমস্ত পৃথিবীতে এই দীন প্রতিষ্ঠা করা, তাঁর অবর্ত্তমানে তাঁর গঠিত এই উম্মাহর ওপর অর্পিত হোয়েছে। তাঁর ঐ উম্মাহ যে,

ঐ দায়িত্ব সম্বন্ধে কতখানি সচেতন ছিলো তার প্রমাণ পাওয়া যায় বিশ্বনবীর এন্তেকালের পর তাঁর উম্মাহর ইতিহাস থেকে। সে ইতিহাস হোল এই যে, নেতার পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত জাতিটি অস্ত্র হাতে স্বদেশ (আরব) থেকে বের হোয়ে উত্তাল ঢেউয়ের মত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পোড়লো এবং সর্বদিক দিয়ে তাদের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী দুইটি বিশ্বশক্তিকে সামরিকভাবে পরাজিত কোরে তদানিন্তন অর্দ্ধেক পৃথিবীতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ তওহীদ ভিত্তিক সত্যদীন প্রতিষ্ঠা কোরলো। ঐ উম্মাহর শতকরা আশি জনেরও বেশীর কবর তাদের স্বদেশ আরবের বাইরে হোয়েছে।

তাঁর নিজের ওপর আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব তাঁর উম্মাহর ওপর অর্পণ কোরে বিশ্বনবী বোলেছিলেন- **যে বা যারা আমার সুন্নাহ ত্যাগ কোরবে সে বা তারা আমার কেউ নয়, আমি তাদের কেউ নই** [হাদীস- বুখারী, মোসলেম, মেশকাত] । আমার কেউ নয় অর্থ অবশ্যই উম্মতে মোহাম্মদী নয়। কোন্ সুন্নাহ ত্যাগ কোরলে উম্মতে মোহাম্মদী থেকে বহিষ্কার? সেটা হোচ্ছে অন্যান্য সমস্ত জীবন-ব্যবস্থা, দীনগুলিকে সামরিকভাবে পরাজিত কোরে সার্বিক জীবনে তওহীদ অর্থাৎ সত্যদীনকে প্রতিষ্ঠার জেহাদ। 'আমার সুন্নাহ' বোলে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত অভ্যাস, পছন্দ-অপছন্দ, পোষাক-পরিচ্ছদ বোঝান নি। পরবর্তীতে সশস্ত্র সংগ্রাম, জেহাদ ছেড়ে রাজত্ব করার সময় প্রকৃত সুন্নাহর বিকল্প হিসাবে ঐগুলিকে সুন্নাহ বোলে চালু করা হোয়েছে ও আজও তাই চোলছে। উম্মতে মোহাম্মদীর সংজ্ঞা হোল- **আল্লাহ যে কাজের দায়িত্ব দিয়ে তাঁর রসুলকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন ও যে দায়িত্ব তিনি তাঁর গঠিত জাতির ওপর অর্পণ কোরে চোলে গিয়েছেন, যে বা যারা সেই কাজ চালিয়ে যাবে শুধু তারাই উম্মতে মোহাম্মদী।** যারা সেই কাজ অর্থাৎ জেহাদ চালিয়ে যাবে না তারা যতো বড় মুসুল্লিই হন, যতো বড় মুত্তাকি, আলেম, দরবেশ, পীর-মাশায়েখ হোন না কেন- উম্মতে মোহাম্মদী নন। হাশরের দিন তাঁর উম্মত হিসাবে রসুলের শাফায়াতের ওপর তাদের কোন দাবী থাকবে না।

১৪। এই দীনের প্রধান এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাগ বা অংশ হোল দুইটি:- একটি হোল দীন নিজেই। এটা হোল ফরদে আইন, অবশ্য কর্ত্তব্য, কোরতেই হবে অর্থাৎ ঈমান (তওহীদ), সালাত (নামায), যাকাত, হজ্ব ও সওম (রোযা)। আর দ্বিতীয়টি হোল ঐ দীনকে প্রতিষ্ঠা করার

জন্য জেহাদ, সর্বাত্মক প্রচেষ্টা, সংগ্রাম। **দীন যদি মানুষের সমষ্টিগত জীবনে প্রতিষ্ঠাই না হয় তবে দীনের আর কোন দাম নেই।** এই জন্যই আল্লাহ রসুলের মাধ্যমে দীন দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, তিনি তাঁর রসুলকে আদেশ দিয়েছেন যুদ্ধ কোরে সেই দীন সমস্ত পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা কোরতে। আল্লাহর সেই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর রসুল বোলেছেন- আমি আদিষ্ট হোয়েছি সশস্ত্র সংগ্রাম (কেতাল) চালিয়ে যেতে যে পর্য্যন্ত না সমস্ত পৃথিবীর মানুষ লা এলাহা এল্লাল্লাহ, মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ একথা স্বীকার কোরে নেয়। যে বা যারা দীনের শুধু প্রথম অংশটুকু পালন কোরলো অর্থাৎ ফরদে আইন পালন কোরলো সে জান্নাতে স্থান পাবার অধিকার পেয়ে গেলো একথা ঠিক, কারণ আল্লাহ ও তাঁর রসুল বারবার বোলেছেন যে মৃত্যু পর্য্যন্ত তওহীদে (সর্বব্যাপী তওহীদ) অটল থাকবে তার আর কোন ভয় নেই, কারণ তার হাতে জান্নাতের চাবী এসে গেছে। কিন্তু যেহেতু ঐ তওহীদ ও দীন সমস্ত মানব জাতির ওপর কার্য্যকর না করা গেলে এবলিসের চ্যালেঞ্জে আল্লাহ হেরে যাবেন, সেহেতু ঐ জেহাদও অবশ্য কর্ত্তব্য, ফরদ। সেজন্যই আল্লাহর রসুলকে যখন প্রশ্ন করা হোয়েছিলো, এই দীনে সবচেয়ে উত্তম কাজ (আমল) কি? তখন তিনি জবাবে বোলেছিলেন, আল্লাহ ও তাঁর রসুলের ওপর ঈমান। আবার তাকে প্রশ্ন করা হোলো, তারপর কোন কাজ? তিনি জবাব দিলেন- আল্লাহর পথে জেহাদ। আবার প্রশ্ন করা হোল, তারপর কোন আমল? তিনি জবাব দিলেন- মকবুল হজ্ব। [হাদীস- আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে মোসলেম, বোখারী]। **তওহীদের ওপর ঈমানের পরই শ্রেষ্ঠ আমল ঐ তওহীদ প্রতিষ্ঠার জেহাদ** বোলেই তার পুরস্কার আল্লাহ রেখেছেন এসলামের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ও সম্মান, যে পুরস্কার ও সম্মান কয়েকটি বৈশিষ্ট্যে আল্লাহর নবীদেরও ছাড়িয়ে গেছে। বিশ্বনবী বোলেছেন- যে লোক (এখানে যে লোক বোলতে অবশ্যই ঈমানদার, মো'মেনদের বুঝাচ্ছেন) জেহাদ কোরলো না এবং জেহাদ করার সংকল্পও কোরলো না, সে মোনাফেকের একটি স্তরে অবস্থান অবস্থায় মারা গেলো [হাদীস- আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে মোসলেম, মেশকাত]। মোনে রাখতে হবে মোনাফেকদের স্থান হবে জাহান্নামের (আগুনের) সবচেয়ে নিচে এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শাস্তির স্থানে (কোর'আন- সুরা নেসা ১৪৫)। অর্থাৎ এ ঈমানদারের সমস্ত জীবনের ঐ এবাদতের কোন দাম রোইল না। বিশ্বনবী আরও বোলেছেন- জান্নাতের দরজাগুলি তলোয়ারের ছায়ার নিচে অবস্থিত [হাদীস- আবু মুসা (রাঃ) থেকে মোসলেম,

মেশকাত]। অর্থাৎ যে মো'মেনের (ঈমানদারের) তলোয়ারের অর্থাৎ অস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক নেই তিনি কোন দরজা দিয়েই জান্নাতে প্রবেশ কোরতে পারবেন না। এ ব্যাপারে লিখতে গেলে শেষ নেই।

আমি আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এইটুকু বুঝি যে, যদি কিছু সংখ্যক লোক নিয়ে একটি সমিতি গঠন করা হয় এবং ঐ সমিতির গঠনতন্ত্রে, সংবিধানে (Constitution) যদি একথা লেখা হয় যে, এই সমিতির যে সভ্য, মেম্বার বিশ্ব অলিম্পিকে সাঁতারের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে স্বর্ণপদক জিতে আনতে পারবে, সেই সভ্যকে ঐ সমিতির পক্ষ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার দেয়া হবে, সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন করা হবে, তবে ঐ সমিতিটিকে সাঁতারের সমিতি ছাড়া অন্য কোন কিছুর সমিতি বলা যাবে কি? ওটাকে ফুটবলের বা তাস খেলার বা ক্রিকেট খেলার সমিতি বলা যাবে কি? অবশ্যই তা বলা যাবে না এবং অবশ্যই বোলতে হবে যে ওটা সাঁতারের সমিতি, সাঁতারুদের সমিতি। যারা সাঁতার জানে না তাদের ঐ সমিতিতে প্রবেশাধিকার নেই, ওটার সভ্য, মেম্বার হতে গেলে অবশ্যই সাঁতার শিখতে হবে। তাহোলে যে সমিতির (এসলাম, উম্মতে মোহাম্মদী) সংবিধানে, গঠনতন্ত্রে (কোর'আনে) একথা পরিষ্কার ভাষায় লেখা আছে যে, ঐ সমিতির যে সভ্য, মেম্বার যুদ্ধে অংশ নিলে বা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলে তাকে সমিতির পক্ষ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার (জীবনের ছোট বড় সমস্ত গোনাহ, পাপ বিনা প্রশ্নে, বিনা বিচারে- ধুয়ে মুছে ফেলে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করানো, এমন কি কবরের প্রশ্নোত্তর পর্য্যন্ত না করানো) এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান (তাদের মৃত বলাকে নিষিদ্ধ করা) দেয়া হবে সেই সমিতিটিকে যুদ্ধের ও যোদ্ধার সমিতি ছাড়া অন্য কোন সমিতি বলা যাবে কি? শুধু তাই নয়, যে যোদ্ধা নয়, যুদ্ধ জানে না তাকে ঐ সমিতির সভ্যপদ দেয়া যাবে কি? তাই একথা যুক্তিসঙ্গত যে, যে যোদ্ধা নয়, যুদ্ধ জানে না, তাঁর এই দীনুল এসলাম সমিতির প্রাথমিক সভ্যপদেরও (Primary membership) যোগ্যতা নেই, ভালো সভ্য হওয়াতো দুরের কথা।

তাই যে মানুষটি শুধু মানব জাতির মুকুটমণি নন, মানবজাতির প্রথম সারির মানুষ, নবী-রসুলদেরও (আঃ) নেতা, তাকে বোলতে শুনি- আহা! আমি আকুল ভাবে কামনা কোরি আমি যেন আল্লাহর রাস্তায় জেহাদে শহীদ হই, তারপর আমাকে জীবিত করা হয়, আমি আবার শহীদ হই, আবার আমাকে জীবিত করা হয় এবং আবার শহীদ হই, আবার আমাকে জীবিত করা হয় এবং আবার শহীদ হই [হাদীস- আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বোখারী, মোসলেম, মেশকাত] । হাশরের বিচার শেষ হওয়ার পর যাদের জান্নাতে যাবার ও যাদের জাহান্নামে যাবার, তাদের যাবার পর আল্লাহ জান্নাতীদের জিজ্ঞাসা কোরবেন- তোমাদের মধ্যে কেউ আবার পৃথিবীতে ফিরে যেতে রাজী

আছ? স্বভাবতঃই সবাই অস্বীকার করবেন, কারণ জান্নাতের সেই অতুলনীয় সুখ, সেই অকল্পনীয় আনন্দ উপভোগ ছেড়ে কে আবার পৃথিবীর দুঃখ কষ্টের মধ্যে ফিরতে চাইবে? অন্যদের বাদ দিন, এমন কি আল্লাহর নবী-রসুলরাও (আঃ) পৃথিবীতে ফিরতে অস্বীকার করবেন। শুধু শহীদরা উঠে দাঁড়াবেন- বোলবেন আল্লাহ! আমরা আবার পৃথিবীতে ফিরে যেতে রাজি আছি তোমার রাস্তায় জেহাদ কোরে দশবার শহীদ হবার জন্য [হাদীস- আনাস (রাঃ) থেকে বোখারী, মোসলেম, মেশকাত]। চিন্তায় আসে না, ধারণায় আসে না কী সে অসম্ভব পুরস্কার যা পেয়ে মানুষ আবার এই দুঃখ কষ্টময় পৃথিবীতে ফিরে আসতে চায়, আবার আল্লাহর জন্য, তাঁর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণ উৎসর্গ কোরতে; আর আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল, যার জন্য জান্নাতে "মাকামে মাহমুদা" নির্দিষ্ট করা আছে, তিনি আকুল হোয়ে যান শহীদ হবার জন্য। আর আজ বিকৃত আকীদায় আমরা তওহীদের পর এসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ, আমলকে সম্পুর্ণরূপে ত্যাগ কোরে নানা রকম খুঁটি-নাটি এবাদত কোরে ভাবছি আমরা অতি উৎকৃষ্ট মোসলেম হোয়েছি। ঐ তওহীদ ও জেহাদ ত্যাগ করার শাস্তি হিসাবে আল্লাহ যে প্রায় সমস্ত মোসলেম জাতিটিকে দু'শো বছরের জন্য ইউরোপীয় খ্রীস্টানদের দাস বানিয়ে শাস্তি দিলেন এবং আজও যে পৃথিবীময় অন্যান্য জাতি দিয়ে এই জাতিকে পরাজিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত করাচ্ছেন, হত্যা করাচ্ছেন, আমাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়াচ্ছেন, আমাদের মেয়েদের ধর্ষণ কোরে গর্ভবতী করাচ্ছেন, এ সত্য বুঝার জ্ঞানও আমাদের নেই। আকীদার বিকৃতিতে এ কথা বুঝার শক্তিও নেই যে আজ আমাদের নামাজ রোজা হজ্ব, যাকাত কিছুই আল্লাহ গ্রহণ কোরছেন না।

১৫। তাক্ওয়া ও হেদায়াহ:- দীনুল এসলামের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে বর্ত্তমানে আমাদের আকীদা যেমন বিকৃত ও ভুল, তেমনি তাক্ওয়া ও হেদায়াহ সম্বন্ধেও আমাদের ধারণা ভুল। কোন দুষ্ট প্রকৃতির গোনাহগার লোককে যদি উপদেশ দিয়ে মদ খাওয়া ছাড়ানো যায়, চুরি-ডাকাতি ছাড়ানো যায়, তাকে নামাযী বানানো যায়, রোযা রাখানো যায় তবে আমরা বলি- লোকটা হেদায়াত হোয়েছে। ভুল বলি। কারণ আসলে সে হেদায়াত হয় নি, মুত্তাকী হোয়েছে। তাক্ওয়া এবং হেদায়াহ দু'টি সম্পুর্ণ ভিন্ন বিষয়। তাক্ওয়া হোচ্ছে সাবধানে, সতর্কভাবে জীবনের পথ চলা। খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থেকে ভালো কাজ কোরে যাওয়াই হোচ্ছে তাক্ওয়া, পাপ, গোনাহ থেকে বেঁচে সওয়াব, পুণ্যের কাজ কোরে জীবনের পথ চলা হোচ্ছে তাক্ওয়া। কোর'আনের ঐ শব্দকে বাংলায় অনুবাদ করা হোয়েছে 'খোদাভীতি' দিয়ে এবং ইংরাজীতে Fear of God দিয়ে। আল্লাহকে

ভয় না কোরলে পাপ-পূণ্য বেছে চলার প্রশ্ন ওঠে না, কাজেই সে দিক দিয়ে এ শব্দ দু'টি চলে, কিন্তু তাক্ওয়ার পূর্ণ অর্থ প্রকাশ হয় না। কোর'আনের অন্যতম প্রখ্যাত ইংরাজী অনুবাদক মোহম্মদ মারমাডিউক পিকথল তাক্ওয়ার অনুবাদ কোরেছেন Mindful of duty to Allah অর্থাৎ; "আল্লাহর প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সচেতনতা" বোলে। এটাও আংশিক ভাব প্রকাশ করে মাত্র। সংক্ষেপে, আল্লাহ ন্যায়-অন্যায়ের পাপ-পুণ্যের যে মাপকাঠি মানুষের জন্য নির্দ্ধারিত কোরে দিয়েছেন সেই মাপকাঠি সম্বন্ধে সতর্কতা ও সচেতনতা নিয়ে জীবনের পথ চলার নাম তাক্ওয়া। আর হেদায়াহ হোচ্ছে আল্লাহ রসুল যে পথ প্রদর্শন কোরেছেন, যে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন, সেই পথে, সেই দিকে চলা।

তফাৎটা লক্ষ্য কোরতে হবে- **একটা হোচ্ছে কোন নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থানের দিকে পথ চলা (হেদায়াহ), অন্যটি হোচ্ছে পথ চলার সময় সাবধানে, সতর্কতার সাথে পথ চলা,** যাতে পা গর্ত্তে না পড়ে, কাঁদায় পা না পিছলায়, কাঁটায়, ময়লায় পা না পড়ে (তাক্ওয়া) কিম্বা অসতর্ক, অসাবধানে পথ চলা। আল্লাহ যে পথে চোলতে আদেশ দিচ্ছেন সেটা হোল সেরাতুল মুস্তাকীম- সহজ, সরল পথ, জীবনের সর্বস্তরে, সর্ব অঙ্গনে, সর্ব বিভাগে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো আইন-কানুন, নীতি নির্দেশ অস্বীকার করা এবং তাকে ছাড়া আর কারো উপাসনা না করা- এক কথায় তওহীদ; এই সহজ সোজা কথা। আর ঐ পথের, সেরাতুল মুস্তাকীমের লক্ষ্য হোল সর্বাত্মক সংগ্রামের মাধ্যমে ঐ তওহীদকে সমস্ত পৃথিবীতে মানব জীবনে প্রয়োগ ও কার্য্যকরী কোরে সুবিচার ও শান্তি (এসলাম) প্রতিষ্ঠা করা। কোর'আনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তাক্ওয়া ও হেদায়েতের পার্থক্যও দেখিয়ে দিয়েছেন। কোর'আনের শুরুতেই তিনি বোলেছেন, এই বই সন্দেহাতীত; এটা মুত্তাকীদের (সাবধানে, সতর্কতার সাথে পথ চলার পথিকদের) জন্য হেদায়াহ (সঠিক পথ প্রদর্শন, সঠিক দিক নির্দেশনা) (কোর'আন- বাকারা ২)। পরিষ্কার দু'টো আলাদা বিষয় হোয়ে গেলো একটি তাক্ওয়া, অন্যটি হেদায়াহ, একটি সাবধানে পথ চলা, অন্যটি সঠিক পথে চলা। আল্লাহ তাঁর রসুলকে বোলেছেন আমি তোমাকে সেরাতুল মুস্তাকিমে হেদায়াত কোরেছি (কোর'আন- ফাতাহ ২)। অন্যত্র তিনি তাঁর নবীকে বোলছেন- তিনি (আল্লাহ) কি তোমাকে হেদায়াত করেন নি (কোর'আন- দোহা ৭)? বর্ত্তমানের বিকৃত আকীদায় **মুত্তাকী হওয়া মানেই যদি হেদায়াত হওয়া হয় তবে বিশ্বনবীকে আবার হেদায়াত করার প্রয়োজন কি?** নবুয়াত পাবার আগেও যার গোনাহ ছিলো না, যার চেয়ে বড় মুত্তাকী আর কেউ নেই, তাকে হেদায়াত করার প্রয়োজন কি?

আল্লাহ রসুলের দেয়া দিক-নির্দেশনা (হেদায়াত) আজ এই জাতির সম্মুখ থেকে অদৃশ্য হোয়ে গেছে, এই জাতি এখন **ঐ দিক-নির্দেশনার ঠিক বিপরীতদিকে চোলছে,** তাই হেদায়াহ আর তাক্ওয়ার অর্থ আমাদের কাছে এক অর্থ হোয়ে গেছে। আল্লাহর দেখানো পথে, সঠিক পথে অর্থাৎ সেরাতুল মুস্তাকীমে দু'ভাবে চলা যায়। তাক্ওয়ার সাথেও চলা যায়, তাক্ওয়া বাদ দিয়েও চলা যায়। পথ যদি সঠিক থাকে, দিক-নির্দেশনা, গন্তব্যস্থান যদি ঠিক থাকে তবে তাক্ওয়াহীন ভাবে চোললেও মানুষ তার গন্তব্যস্থানে পৌঁছবে, রাস্তায় পা পিছলে আছাড় খেয়ে গায়ে, কাপড়ে কাঁদামাটি মেখেও সে তার গন্তব্যস্থানে, জান্নাতে পৌঁছবে। কিন্তু ঐ সঠিক পথে যদি সে না থাকে তবে অতি সতর্কতার সাথে পথ চোললেও, আছাড় না খেলেও, কাপড়ে, পায়ে কোন ময়লা না লাগলেও সে তার গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পারবে না, সে পৌঁছবে জাহান্নামে। আল্লাহর রসুল যখন আবু যরকে (রাঃ) বোলছেন- হে আবু যর! যে লোক মৃত্যু পর্য্যন্ত তওহীদে অটল থাকবে সে লোক ব্যাভিচার কোরলেও, চুরি কোরলেও জান্নাতে যাবে [হাদীস- আবু যর (রাঃ) থেকে বোখারী, মোসলেম, মেশকাত], তখন তিনি ঠিক এই কথাই বুঝাচ্ছিলেন- ঐ ব্যভিচারী, চোর তাক্ওয়ায় নেই, কিন্তু হেদায়াতে অর্থাৎ সেরাতুল মুস্তাকীম- সহজ সোজা রাস্তায় অর্থাৎ তওহীদে আছে। তারপর লক্ষ্য করুন সেই ঘটনাটির দিকে- একজন লোকের জানাযার নামায পড়ার জন্য লোকজন সমবেত হোলে রসুলুল্লাহ সেখানে এলেন। ওমর (রাঃ) বিন খাত্তাব বোললেন- ইয়া রসুলাল্লাহ! আপনি এর জানাযার নামায পড়াবেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বোললেন, ঐ লোকটি অত্যন্ত খারাপ প্রকৃতির দুষ্কৃতিকারী লোক ছিলেন। শুনে বিশ্বনবী সমবেত জনতার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা কোরলেন- তোমাদের মধ্যে কেউ এই লোকটিকে কখনও এসলামের কোন কাজ কোরতে দেখেছো? একজন লোক বোললেন- ইয়া রসুলাল্লাহ! আমি একে একবার আল্লাহর রাস্তায় (জেহাদে) একরাত্রি (অন্য একটি হাদীসে অর্দ্ধেক রাত্রি) পাহারা দিতে দেখেছি। এই কথা শুনে মহানবী ঐ মৃত ব্যক্তির জানাযার নামায পড়ালেন, তাকে দাফন করার পর, (তাকে উদ্দেশ্য কোরে) বোললেন তোমার সঙ্গীরা মোনে কোরছে তুমি আগুনের অধিবাসী (জাহান্নামী), কিন্তু আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি জান্নাতের অধিবাসী [হাদীস- ইবনে আয়াজ (রাঃ) থেকে বায়হাকী, মেশকাত] ।

এসলামের প্রকৃত আকীদা বুঝতে গেলে এই দুইটি হাদীস গভীর ভাবে চিন্তা কোরতে হবে। ওমর (রঃ) যখন রসুলাল্লাহকে বোললেন যে ঐ মৃত লোকটি অত্যন্ত খারাপ লোক ছিলেন তখন সমস্ত

লোকজন থেকে কেউ ও কথার আপত্তি কোরলেন না, অর্থাৎ ওমরের (রাঃ) ঐ কথায় সবাই একমত। একমত হবার কথাই- কারণ হাদীসের ব্যাখ্যাকারীগণ বোলেছেন ঐ মৃত লোকটি ডাকাত ছিলেন- বণিকদের কাফেলা আক্রমণ কোরে লুটপাট কোরতেন। তারপর মহানবী যখন সমবেত লোকজনকে জিজ্ঞাসা কোরলেন তাদের মধ্যে কেউ ঐ মৃত লোকটিকে কোনদিন এসলামের কোন কাজ কোরতে দেখেছেন কিনা তখন ঐ একমাত্র লোক ছাড়া আর কেউ বোলতে পারলেন না যে তাকে কোনদিন এসলামের কোন কাজ কোরতে দেখেছেন। বিশ্বনবী বোলেছিলেন এসলামের কোন কাজ, শব্দ ব্যবহার কোরেছিলেন- আমলেল এসলাম। এসলামের আমল কি? অবশ্যই নামায, যাকাত, হজ্ব, রোযা ইত্যাদি আরও বহুবিধ ফরয, ওয়াজেব, সুন্নত, নফল ইত্যাদি। কেউ তাকে কোনদিন এসলামের কোন কাজ কোরতে দেখেন নি অর্থাৎ কেউ তাকে ওগুলির কিছুই কোরতে দেখেন নি। একটি দুশ্চরিত্র ঘৃণিত ডাকাত যাকে কেউ কোনদিন কোন এবাদত করতে দেখে নি, শুধু মাত্র জেহাদে যেয়ে অর্দ্ধেক রাত্রি মোসলেম শিবির পাহারা দেয়ার জন্যই আল্লাহর রসুল প্রকাশ্যে ঘোষণা দিলেন যে ঐ লোক জান্নাতী এবং তিনি স্বয়ং সে ব্যাপারে সাক্ষী। কেন? **এই জন্য যে, যারা পৃথিবীতে তওহীদ প্রতিষ্ঠা কোরে মানব জীবনের সমস্ত অন্যায় অবিচার মুছে ফেলে, আল্লাহকে এবলিসের চ্যালেঞ্জে জয়ী করাবার জন্য সশস্ত্র সংগ্রামে নেমেছিলেন, ঐ লোকটি তাদের সঙ্গে ছিলেন এবং অর্দ্ধেক রাত্রি ঐ যোদ্ধাদের শিবির পাহারা দেওয়ার মত সামান্য কাজ কোরেছিলেন।**

আমি পেছনে বোলে এসেছি- এসলামের সর্বপ্রধান ভাগ ও সর্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য দু'টি। একটি হোল সর্বব্যাপী তওহীদ, দ্বিতীয়টি হোল ঐ তওহীদ মানব জীবনে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। কাজেই যারা ঐ দুইটি কাজ কোরেছেন তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম হোয়ে গেছে, জান্নাত নির্দিষ্ট হোয়ে গেছে। তাদের ব্যক্তিগত গোনাহ যতোই থাকুক, এমন কি এই পৃথিবী পূর্ণ কোরে দেয়া যায় এত পাপ থাকলেও আল্লাহ বোলেছেন তিনি তাকে জান্নাতে দেবেন (হাদীস- তিরমিজি)। **এই আকীদা এবং বর্ত্তমানে প্রচলিত এসলামের আকীদা সম্পুর্ণ বিপরীতমুখী আকীদা।** তাই আজ আমরা একটি অভিশপ্ত (মালাউন) জাতির মত পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত জাতি দিয়ে পরাজিত হোচ্ছি, অপমানিত, লাঞ্ছিত হোচ্ছি, তারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আমাদের হাজারে হাজারে হত্যা কোরছে, আমাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে, আমাদের মেয়েদের নিয়ে যাচ্ছে, তাদের ধর্ষণ কোরে গর্ভবতী

কোরছে, আমরা কিছুই কোরতে পারছি না। সংখ্যায় একশ' কোটির বেশী হোয়েও কিছুই কোরতে পারছি না, পোড়ে পোড়ে মার খাচ্ছি। আমাদের সাহায্যের জন্য কেউ নেই। আল্লাহও আমাদের সাহায্যের জন্য একটি আঙ্গুল তুলছেন না, কারণ আমরা তাঁর দেয়া দিক নির্দেশনার ঠিক বিপরীত দিকে চোলেছি, তওহীদ ও জেহাদ ত্যাগ কোরেছি, তাঁর চোখে আমরা আর মো'মেনও নই, মোসলেমও নই, তাঁর রসুলের উম্মত তো দুরের কথা। আর তার চেয়েও করুণ ও হাস্যকর হোল এই যে তবুও আমরা অতি নিষ্ঠার সাথে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ও তারাবি, তাহাজ্জুদ, দাড়ি, টুপি, মেছওয়াক নিয়ে ব্যস্ত আছি এবং ভাবছি আমরা অতি উৎকৃষ্ট মো'মেন তো বটেই, অতি উৎকৃষ্ট উম্মতে মোহাম্মদীও। আকীদা বিকৃত ও বিপরীত হোয়ে যাবার ফলে এ কথা বুঝছি না যে এই **সব এবাদতের পূর্বশর্ত্ত (Pre-condition) হোচ্ছে হেদায়াহ, তওহীদ;** বুঝছি না যে ঐ হেদায়াতে নেই বোলে, ঐ হেদায়াতের বিপরীত দিকে চোলছি বোলে আমাদের হাজারো এবাদত হাজারো তাক্ওয়া নিষ্ফল, তা কোন কাজে আসবে না, আল্লাহর কাছে কবুল হবে না। এই দুনিয়াতে আল্লাহ যেমন খ্রীস্টান, ইহুদী, হিন্দু, বৌদ্ধর (পৃথিবীর প্রধান সব ক'টি জাতি) হাতে আমাদের পরাজিত, অপমান, অপদস্থ, লাঞ্ছিত কোরছেন, ঠিক তেমনি আখেরাতেও তাঁর মালায়েকদের দিয়ে শাস্তি দেওয়াবেন এবং সে শাস্তি হবে এই দুনিয়ার শাস্তির চেয়ে বহুগুণ সাংঘাতিক, বহুগুণ ভয়ঙ্কর।

হেযবুত তওহীদের কর্মসূচি

আদম (আঃ) থেকে শুরু কোরে মোহাম্মদ (দঃ) পর্য্যন্ত আল্লাহ যতো নবী রসুল (আঃ) **মানব জাতির পথ প্রদর্শনের জন্য পাঠিয়েছেন তাদের প্রত্যেককেই যে মূল-মন্ত্র দিয়ে পাঠিয়েছেন তা হোচ্ছে তওহীদ, আল্লাহর একত্ব ও সার্বভৌমত্ব।** স্থান, কাল ও পাত্রের বিভিন্নতার কারণে দীনের অর্থাৎ জীবন ব্যবস্থার আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, এবাদতের পদ্ধতি ইত্যাদি বিভিন্ন হোয়েছে কিন্তু ভিত্তি, মূলমন্ত্র একচুলও বদলায় নি। সেটা সব সময় একই থেকেছে- আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, তওহীদ। এই সার্বভৌমত্বের, তওহীদেরই অপর নাম সেরাতুল মুস্তাকীম, দীনুল-কাইয়্যেমা, চিরন্তন, শাশ্বত, সনাতন জীবন পথ। প্রেরিত প্রত্যেক নবী-রসুলকে আল্লাহ এই দায়িত্ব দিয়েছেন তারা যেন তাদের নিজ নিজ জাতিকে এই তওহীদের অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্বের অধীনে নিয়ে আসেন। নবী-রসুলদের এই ধারাবাহিকতায় আল্লাহ যাকে শেষ নবী হিসেবে পাঠালেন তিনিই হোচ্ছেন আমাদের নেতা মোহাম্মদ (দঃ) বিন্ আবদুল্লাহ। পূর্ববর্তী সমস্ত নবী রসুলদের সঙ্গে-এর পার্থক্য হোল এই যে, পূর্ববর্তী নবীদের দায়িত্ব সীমিত ছিল তাদের যার যার জাতি, গোষ্ঠি, গোত্রের মধ্যে আর এর উপর আল্লাহ ভার দিলেন সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে এই তওহীদের ছত্রছায়ায় নিয়ে আসার। আল্লাহ বোললেন আমি আমার রসুলকে সঠিক পথ প্রর্দশন (হেদায়াহ) এবং সত্য ধর্ম (দীনুল হক) দিয়ে প্রেরণ কোরলাম এই জন্যে যে তিনি যেন একে (এই হেদায়াহ ও জীবন ব্যবস্থাকে) পৃথিবীর অন্যান্য সমস্ত জীবন ব্যবস্থার উপর বিজয়ী করেন (কোর'আন-সুরা আল্ ফাতাহ- ২৮, সুরা আত তওবা- ৩৩ ও সুরা আস সফ- ৯)। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর শেষ রসুলকে দায়িত্ব দিলেন এই দীনুল এসলামকে সমস্ত পৃথিবীর ওপর বিজয়ী ও প্রতিষ্ঠা করার। কোর'আনের এই তিনটি আয়াত থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহ তাঁর নবীর মাধ্যমে শুধু হেদায়াহ এবং সত্যদীন দিয়েই ক্ষান্ত হোলেন না, তিনি তাঁর নবীর উপর এই দায়িত্বও ঐ সঙ্গেই দিলেন যে, নবী যেন পৃথিবীর অন্যান্য দীন অর্থাৎ জীবন-ব্যবস্থাগুলিকে পরাজিত, নিষ্ক্রয় কোরে দিয়ে এই সত্যদীনকে প্রতিষ্ঠা ও কার্য্যকর করেন। অর্থাৎ **পৃথিবীতে, মানব জাতির মধ্যে আল্লাহর রসুলকে প্রেরণের উদ্দেশ্য একটি নয়, দুইটি।** একটি রসুলের মাধ্যমে হেদায়াহ, পথ প্রদর্শনসহ দীন পাঠানো, দ্বিতীয়টি সেই হেদায়াহ ও দীনকে সমগ্র মানব জীবনে প্রতিষ্ঠা করা। কারণ সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায় (যদিও এই সাধারণ জ্ঞানটাই বর্ত্তমান 'মোসলেম'

দুনিয়ায় নেই) যে **দীন, জীবন ব্যবস্থা যদি মানুষের জীবনে কার্য্যকরই না হয় তবে তা রসুলের মাধ্যমে পৃথিবীতে পাঠানো অর্থহীন।** একটি সংবিধান (Constitution) সেটি যতো সুন্দর, যতো নিখুঁতই হোক না কেন, সেটা একটি জনসমষ্টি বা জাতির ওপর প্রয়োগ ও কার্য্যকর না করা হোলে যেমন সেটা অর্থহীন, তেমনি তওহীদের ওপর ভিত্তি করা দীনুল এসলাম, দীনুল হকের সংবিধান কোর'আনকে মানব জীবনের সর্বস্তরে, সর্ব অঙ্গনে প্রয়োগ ও কার্য্যকর না কোরতে পারলে তা অর্থহীন। **তাই আল্লাহ তাঁর রসুলকে ঐ উভয় দায়িত্ব দিয়েই পৃথিবীতে প্রেরণ কোরলেন।**

এখন প্রশ্ন হোল, এই দীন, জীবন-ব্যবস্থাকে সমস্ত পৃথিবীর উপর প্রতিষ্ঠা করার মত বিরাট, বিশাল কাজে সাফল্য অর্জন করার প্রক্রিয়া কী হবে? আল্লাহ তাঁর রসুলকে এত বড় কাজের দায়িত্ব দিলেন। **তাঁর রসুল কী ভাবে, কী পদ্ধতিতে অর্থাৎ কী তরিকায় কাজ কোরলে তাতে সাফল্য লাভ কোরবেন তা কি তাকে বোলে দেবেন না, তাকে শিখিয়ে দেবেন না?** তিনি যদি তা না দেন তবে রসুলকে নিজেই চিন্তা ভাবনা কোরে নিজের কাজের পদ্ধতি, তরিকা, কর্মসূচি তৈরী কোরে নিতে হবে এবং তবে আল্লাহ আর সোবহান অর্থাৎ নিখুঁত, ত্রুটিহীন থাকবেন না। কিন্তু আল্লাহ্ অবশ্যই সোবহান, তাঁর কোনো কাজে কোন খুঁত নেই, তাই তিনি তাঁর রসুলকে যেমন আদেশ দিলেন এই পৃথিবীর সমস্ত দীন, জীবন ব্যবস্থাগুলিকে পরাজিত কোরে, নিষ্ক্রয় কোরে আল্লাহর দেয়া হেদায়াহ- দিক নির্দেশনা ও সত্যদীনকে প্রতিষ্ঠা কোরতে, **তেমনি তাকে এই কাজ করার নীতি ও কর্মসূচিও দান কোরলেন।** আল্লাহ জানেন এত বিরাট, বড় কাজে বাধাও অবশ্যই আসবে বিরাট হোয়ে। ঐ কঠিন বাধা অতিক্রম কোরে আল্লাহর দীনকে সমস্ত পৃথিবীময় প্রতিষ্ঠার নীতি ও প্রক্রিয়া কি হবে? মানুষকে বুঝিয়ে? বক্তৃতা, ওয়াজ কোরে? বই পুস্তক লিখে? যুক্তি তর্ক কোরে? এই জীবন ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব, মাহাত্ম্য বর্ণনা কোরে? প্রচার, তবলিগ কোরে? মিটিং, মিছিল কোরে? শ্লোগান দিয়ে, নির্বাচন কোরে? এই প্রশ্নের জবাব আল্লাহর রসুল নিজেই দিয়ে গেছেন। তিনি বোলেছেন- আমি আদিষ্ট হোয়েছি মানব জাতির বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম (যুদ্ধ) চালিয়ে যেতে যে পর্য্যন্ত না সমস্ত মানুষ আল্লাহকে একমাত্র এলাহ এবং আমাকে তাঁর রসুল বোলে মেনে নেয় (হাদীস- আবদাল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে- বোখারী, মেশকাত) । অর্থাৎ ঐ সব কোন প্রক্রিয়া (তরিকা) নয়, এসলামকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা কোরতে হবে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে। এ সিদ্ধান্ত কি রসুলের নিজের? না, তাঁর নিজের নয়, কারণ তিনি বোলেছেন "আমি আদিষ্ট হোয়েছি।"

তিনি আদিষ্ট অর্থাৎ আদেশ প্রাপ্ত হোয়েছেন কার? অবশ্যই আল্লাহর, আল্লাহ ছাড়া আর কার সাধ্য তাকে আদেশ দেয়? অর্থাৎ এই দীনকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি, প্রক্রিয়া যে অন্য কোন পন্থা নয় সশস্ত্র সংগ্রাম **এ সিদ্ধান্ত আর কারো নয়, স্বয়ং আল্লাহর।** আল্লাহর কোর'আনে শত শতবার সশস্ত্র সংগ্রামের উল্লেখ, আদেশ ও তাগিদ, ছোট বড় সমস্ত গোনাহের ক্ষমা, যোদ্ধাদের সরাসরি জান্নাতে প্রবেশ করানোর প্রতিশ্রুতি, শহীদদের মৃত না বলার সম্মান ও রসুলের মাত্র ৯ বছরের মধ্যে ১০৭টি যুদ্ধ থেকেই আর সন্দেহের কোন অবকাশই থাকে না যে **সর্বজ্ঞানী আল্লাহ তাঁর দীনকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্যে সশস্ত্র সংগ্রাম, যুদ্ধকেই নীতি হিসেবে বেছে নিয়েছেন।**

এই নীতির উপর ভিত্তি করা একটি কর্মসূচি আল্লাহ তাঁর রসুলকে দান কোরলেন। তাকে জানিয়ে দিলেন যে, সমস্ত পৃথিবীতে এই হেদায়াহ ও সত্যদীন প্রতিষ্ঠা কোরতে পাঁচ দফার এই কর্মসূচিই হবে তোমার প্রক্রিয়া, তরিকা। আল্লাহর রসুলের পবিত্র জীবনের দিকে শুধুমাত্র একবার তাকালেই কোন সন্দেহ থাকে না যে আল্লাহর দেয়া ঐ কর্মসূচিই তিনি অক্ষরে অক্ষরে সারা জীবনে বাস্তবায়িত কোরে গেছেন। তারপর তিনি পৃথিবী থেকে চোলে যাবার পর তাঁর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার সংগ্রামও যেন ঐ কর্মসূচির উপর ভিত্তি কোরেই চলে, অন্য কোন পন্থায় না যায় সেজন্য সেটা তিনি তাঁর উম্মাহর উপর অর্পণ কোরে গেলেন। এই ৫ দফা কর্মসূচি তিনি তাঁর উম্মাহর উপর অর্পণ করার সময় বোলছেন- **এই কর্মসূচি আল্লাহ আমাকে দিয়েছেন,** (আমি সারাজীবন এই কর্মসূচি অনুযায়ী সংগ্রাম কোরেছি) এখন এটা তোমাদের হাতে অর্পণ কোরে আমি চোলে যাচ্ছি। আরও বোললেন- যে বা যারা এই ৫ দফা কর্মসূচির বন্ধন থেকে মাত্র এক বিঘত পরিমাণও সোরে গেল সে তার গলা থেকে এসলামের রজ্জু খুলে ফেললো (সে এই দীন থেকে বের হোয়ে গেলো)। অবশ্য তওবা কোরে সে আবার এই বন্ধনীতে ফিরে আসলে অন্য কথা, সে মাফ পেতে পারে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, **রসুলের দুনিয়া থেকে চোলে যাবার পর তাঁর উম্মাহ এই ৫ দফা কর্মসূচি তাদের জান-মাল দিয়ে বাস্তবায়ন কোরে গেছেন,** যার ফলে প্রায় অর্দ্ধেক পৃথিবী আল্লাহর দীনের শাসনের অধীনে চোলে এসেছিল।

দুর্ভাগ্যবশতঃ বিশ্বনবীর ওফাতের ৬০/৭০ বৎসর পর **এবলিস এই উম্মাহর আকীদায় বিকৃতি ঢুকিয়ে দিতে সমর্থ হোল।** যার ফলে এই জাতি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ ও ঐ ৫ দফা কর্মসূচি দু'টোই ত্যাগ কোরে এসলাম ও উম্মতে মোহাম্মদী দু'টো থেকেই বহিষ্কৃত হোয়ে গেল। যে

কর্মসূচির বন্ধনী থেকে মাত্র এক বিঘত অর্থাৎ আধ হাত সরে গেলে ঈমান, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত সব নিয়েও দীনুল এসলামের রশি গলা থেকে খুলে যায়, সেই বন্ধনীকে সম্পুর্ণ পরিত্যাগ করার পর যে উম্মতে মোহাম্মদী থাকা অসম্ভব একথা তো সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায়। এই জন্য মহানবী ভবিষ্যদ্বাণী কোরেছেন - আমার উম্মাহর আয়ু ৬০/৭০ বছর (হাদীস - আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে তিরমিযি ও ইবনে মাজাহ, মেশকাত)। অর্থাৎ তাঁর প্রকৃত উম্মাহ পৃথিবীতে থাকবে ৬০/৭০ বছর, তারপর যেটা থাকবে **সেটা নামে মাত্র উম্মতে মোহাম্মদী, সেটা প্রকৃত পক্ষে উম্মতে মোহাম্মদী নয়।**

জেহাদ ও ঐ কর্মসূচি পরিত্যাগ করার শাস্তি হিসাবে আল্লাহ এই জাতিকে ইউরোপের খ্রীস্টান জাতিগুলির গোলাম, দাস বানিয়ে দিলেন। কারণ তিনি তাঁর কোর'আনে বোলেছেন- তোমরা যদি (সামরিক) অভিযানে (অর্থাৎ জেহাদে) বের হওয়া ছেড়ে দাও তবে আমি তোমাদের সাংঘাতিক শাস্তি দেবো এবং তোমাদের বদলে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠা কোরবো (কোর'আন- সুরা তওবা-৩৯)। আল্লাহর উল্লেখিত ঐ ভয়াবহ শাস্তি ও ঐ ঘৃণিত দাসত্ব আজও শেষ হয় নি, **আজও আমরা প্রকৃতপক্ষে ইউরোপের, আমেরিকার, খ্রীস্টানদের দাসই আছি।** তাদের হুকুমের, ইচ্ছার বাইরে যাওয়ার সাধ্য নেই। আল্লাহর রসুলের ৬০/৭০ বছর পর ঐ ৫ দফা কর্মসূচি যে পরিত্যক্ত হোয়েছিলো এই তেরশ' বছর ওটা পরিত্যক্ত হোয়েই ছিলো। হাদীসের বই কেতাবগুলিতে কর্মসূচির ঐ হাদীসটি যথাস্থানেই আছে। এই তেরশ' বছরে এটি লক্ষ-কোটিবার পড়া হোয়েছে, পোড়েছেন লক্ষ লক্ষ আলেম, ফকিহ, মুফাসসের, মোহাদ্দেস, শায়েখ, দরবেশরা, **কিন্তু বোঝেন নি যে এটি এই উম্মাহর জন্য স্রষ্টার দেয়া ৫ দফার একটি কর্মসূচি, তরিকা।** তাদের অত এলেম, বিদ্যা-বুদ্ধি সত্বেও আল্লাহই তাদের এ সত্য বুঝতে দেন নি, কারণ- আকীদার বিকৃতির কারণে তারা ঈমানের পরেই এই দীনে যে কাজ, আমল সর্বশ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে প্রয়োজনীয় (হাদীস- আল্লাহ ও রসুলের ওপর ঈমানের পর সর্বশ্রেষ্ঠ আমল হোচ্ছে জেহাদ, আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বোখারী ও মোসলেম) সেই জেহাদ তারা ত্যাগ কোরেছেন। অর্থাৎ আল্লাহর মনোভাব হোল অনেকটা এই রকম: **যে জেহাদের ওপর ভিত্তি কোরে আমি এই কর্মসূচি দিয়েছি, সেই জেহাদই যখন তোমরা ত্যাগ কোরেছো তখন এই ৫ দফা দায়িত্ব যেটা আমি আমার রসুলকে তাঁর জন্য ও তাঁর উম্মাহর জন্য দিয়েছি এটা যে একটি কর্মসূচি- এই সত্যই তোমাদের বুঝতে দেওয়া হবে না।** গত তেরশ' বছরে এই দীনকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টায় বিভিন্ন

মোসলেম দেশগুলিতে শত শত দল, আন্দোলন, সংগঠন করা হোয়েছে। এগুলির মধ্যে ছোট ছোট দল ও সংগঠনও আছে আবার মিশরের এখওয়ানুল মোসলেমিন ও জেহাদ, আলজেরিয়ার এসলামিক সালভেশন ফ্রন্ট ও জাম'য়া, তিউনিশিয়ার আন-নাহদা, মালয়েশিয়ার আল আরকাম, ইন্দোনেশিয়ার দারুল এসলাম ও এই উপমহাদেশের জামায়াতে এসলামীর মত বড় বড় সংগঠনও আছে। এই সংগঠনগুলিকেও আকীদার বিকৃতির কারণে আল্লাহ ঐ কর্মসূচিকে এই উম্মাহর জন্য আল্লাহ ও রসুলের দেয়া ৫ দফা কর্মসূচি বোলে বুঝতে দেন নি। ফলে ঐ সব সংগঠনগুলির প্রতিষ্ঠাতারা, নেতারা তাদের সংগঠনগুলির জন্য বিভিন্ন রকমের ও বিভিন্ন দফার কর্মসূচি নিজেরা তৈরী কোরে নিয়েছেন এবং সেই অনুযায়ী তাদের কর্মকান্ড পরিচালিত কোরছেন। কোথাও কেউ সাফল্য লাভ করেন নি, পৃথিবীর কোথাও তারা এসলামকে প্রতিষ্ঠা কোরতে পারেন নি। অর্দ্ধশতাব্দীর চেয়েও বেশী সময় ধোরে প্রচেষ্টা কোরেও ইখওয়ানুল মুসলেমিন ও জামায়াতে এসলামীর মত বিরাট সংগঠনগুলিও ব্যর্থ হোয়েছে। **কারণ সবগুলোরই কর্মসূচি মানুষের মস্তিস্ক প্রসূত, আল্লাহর দেয়া নয়।** ফলে ঐ সব সংগঠনগুলি আল্লাহ ও রসুলের তরিকা বাদ দিয়ে ইউরোপীয় খ্রীস্টানদের তরিকা, প্রক্রিয়া গ্রহণ কোরে মিটিং মিছিল, শ্লোগান, নির্বাচনের পথ গ্রহণ কোরেছে। আকীদার বিকৃতির ফলে তারা একথা বুঝতে অক্ষম যে তাদের ঐ প্রক্রিয়া বিশ্বনবীর প্রক্রিয়া, তরিকা নয়- ওগুলি গায়রুল্লাহর, ইউরোপীয় খ্রীস্টানদের তৈরী করা প্রক্রিয়া। ঐ প্রক্রিয়ায় এই সংগঠনগুলি হাজার বছরেও কোথাও এসলাম প্রতিষ্ঠা কোরতে পারবে না। ঐ একই কারণে অর্থাৎ আকীদার বিকৃতির কারণে ঐ সব এসলামী সংগঠনগুলি একথাও বুঝতে পারছে না যে গায়রুল্লাহর, ইহুদী-খ্রীস্টান 'সভ্যতার' সৃষ্ট মিটিং, মিছিল, শ্লোগান, দেয়ালের লিখন ও নির্বাচনের প্রক্রিয়া গ্রহণ কোরে তারা আল্লাহর তওহীদ থেকে বের হোয়ে শের্ক ও কুফরের মধ্যে পতিত হোয়েছেন, তাই আল্লাহর কোন সাহায্য তারা পাচ্ছেন না। কোন কোন দল ও সংগঠন ওপথে ব্যর্থ হোয়ে অন্য ভুল পথ, সন্ত্রাসের পথ ধোরেছেন। তারা এখানে সেখানে বোমা ফাটিয়ে, পর্য্যটকদের গাড়িতে বোমা মেরে, সরকারী নিরাপত্তা বাহিনী, পুলিশের সঙ্গে খন্ড যুদ্ধ কোরে এসলাম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা কোরছেন। এই প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হবে।

দীর্ঘ তেরশ' বছর এই উম্মাহকে এই পবিত্র কর্মসূচি থেকে মাহরুম, বঞ্চিত রাখার পর রাহমানুর রহিম আল্লাহ তাঁর অসীম করুণায় তাঁর দেয়া কর্মসূচির পরিচয় এলহামের মাধ্যমে আমার হৃদয়ে

নাযেল কোরেছেন। আমার মত অশিক্ষিত, অযোগ্য ও মহাগোনাহগার মানুষকে, হেযবুত তওহীদের মত একটি ছোট্ট সংগঠনকে তিনি এত বড় অনুগ্রহ কেন কোরলেন, এত বড় নিয়ামত কেন দান কোরলেন আমি জানি না। মাইয়াশা আল্লাহ (আল্লাহ যা ইচ্ছা তাই করেন) ছাড়া আমি আর কোন কারণ খুঁজে পাই না। এই মহা বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা ও রব, পালনকারী শুধু যে ঐ কর্মসূচি নতুন কোরে আমাদের দান কোরলেন তাই নয়, এ যে তারই কাছ থেকে খাস, বিশেষ দান তা মানুষের মধ্যে প্রকাশ করার জন্যে সর্বসমক্ষে অলৌকিকভাবে দান কোরলেন। হেযবুত তওহীদের সদস্যরা ছাড়াও অনেক বহিরাগত লোকজনও তা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছেন। আমি সারাজীবন আমার রব আল্লাহর পায়ে সাজদায় পোড়ে থাকলেও এ দয়ার, এ নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় কোরতে পারবো না।

কর্মসূচির হাদীসের ব্যাখ্যা

অন্যান্য বহু হাদীসের মত কর্মসূচির এই হাদীসটিরও কয়েকটি এবারত (Version) আছে। একই হাদীস বিশ্বনবীর কাছ থেকে বিভিন্ন সাহাবা (রাঃ) শুনেছেন ও পরে অন্যকে বোলেছেন। ঐ বলার মধ্যে কিছু কিছু তারতম্য এসে গেছে। কারণ সবার স্মৃতিশক্তি একই রকম নয়। একজন হয়তো হাদীসের একটি অংশ মোনে রেখেছেন, কিছুটা ভুলে গেছেন, অন্য একজন সম্পুর্ণ হাদীসটাই মনে রেখেছেন, কিম্বা হয়ত অন্য অংশ মোনে রেখেছেন। অর্থাৎ একজন অন্যজনের সম্পুরক সুতরাং সনদ ঠিক থাকলে আংশিক ও সম্পুর্ণ দু'টোকেই সহীহ অর্থাৎ সঠিক বোলে গ্রহণ করা হোয়েছে। আমাদের কর্মসূচির হাদীসের যে কয়টি এবারত আছে তাতে সামান্য কিছু তফাৎ দেখা যায়। মূল বক্তব্য অর্থাৎ ৫টি দফা একদম ঠিক আছে। একটি হাদীসে আল্লাহর রসুল বোলছেন- আমি তোমাদের ওপর পাঁচটি কাজের দায়িত্ব অর্পণ কোরছি (আল হারিস আল আশয়ারী (রাঃ) থেকে আহমদ, তিরমিযি)। অন্য হাদীসে তিনি বোলেছেন- আল্লাহ আমার ওপর পাঁচটি কাজের দায়িত্ব অর্পণ কোরেছেন, আমি সেই পাঁচটি কাজের দায়িত্ব তোমাদের ওপর অর্পণ কোরছি (আহমদ, তিরমিযি, বাব-উল-এমারাত, মেশকাত)। অর্থাৎ এই হাদীসে "আল্লাহ আমার ওপর পাঁচটি কাজের দায়িত্ব অর্পণ কোরেছেন" এই কথা টুকু বেশী আছে। দ্বিতীয় তফাৎ হোল অজ্ঞতার যুগের কোন

কিছুর দিকে যে আহবান কোরবে সে নিজেকে মোসলেম বোলে বিশ্বাস কোরে নামায পোড়লেও এবং রোযা রাখলেও সে জাহান্নামের জ্বালানী পাথর হবে (আহমদ, তিরমিযি, বাব-উল-এমারাত, মেশকাত)। অন্য হাদীসে শুধু রোযার কথা আছে, নামাযের কথা নেই [আল-হারিস আল-আশয়ারী (রাঃ) থেকে আহমদ, তিরমিযি]। এখন কথা হোচ্ছে - ঐ দুই রকম এবারত থেকে আমাদের গ্রহণ কোরতে হবে যেটায় আল্লাহ আমার ওপর "পাঁচটি কাজের দায়িত্ব অর্পণ কোরেছেন" উল্লেখ আছে এবং যেটায় নামায ও রোযা দু'টোই উল্লেখ আছে। কারণ কোন রা'বি (সাহাবা) রসুলাল্লাহর কোন কথা ভুলে যেতে পারেন, কিন্তু যে কথা তিনি বলেন নাই সে কথা কখনই নিজ থেকে যোগ কোরতে পারেন না, অসম্ভব, কারণ তাহোলে রসুলাল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলা হোল। এই নীতি অনুসরণ কোরলে কর্মসূচির হাদীসটি এইরূপ দাঁড়ায়:

আল্লাহর রসুল বোলেছেন- আল্লাহ আমার ওপর পাঁচটি কাজের দায়িত্ব অর্পণ কোরেছেন, আমি সেই পাঁচটি কাজের দায়িত্ব তোমাদের ওপর অর্পণ কোরছি। সেগুলো হোল:

(১) ঐক্যবদ্ধ হও।

(২) (নেতার আদেশ) শোন।

(৩) (নেতার ঐ আদেশ) পালন করো।

(৪) হেজরত করো।

(৫) (এই দীনুল হক কে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্য) আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করো।

যে ব্যক্তি (কর্মসূচির) **এই ঐক্যবন্ধনী থেকে এক বিঘত পরিমাণও বহির্গত হোল, সে নিশ্চয় তার গলা থেকে এসলামের রজ্জু (বন্ধন) খুলে ফেললো-** যদি না সে আবার ফিরে আসে (তওবা করে) এবং যে ব্যক্তি অজ্ঞানতার যুগের (কোনও কিছুর) দিকে আহ্বান কোরলো, **সে নিজেকে মোসলেম বোলে বিশ্বাস কোরলেও, নামায পোড়লেও এবং রোযা রাখলেও নিশ্চয়ই সে জাহান্নামের জ্বালানী পাথর হবে** [আল হারিস আল আশয়ারী (রাঃ) থেকে আহমদ, তিরমিযি, বাব উল এমারাত, মেশকাত] ।

সমস্ত পৃথিবীতে এই দীনকে প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া, তরিকা অর্থাৎ যে কর্মসূচিটি আল্লাহ তাঁর রসুলকে দিলেন এবং যেটি রসুল তার সারা পবিত্র জীবনে বাস্তবায়িত কোরে আল্লাহর কাছে চোলে যাবার আগে তাঁর উম্মাহর ওপর অর্পণ কোরে গেলেন সেটাকে এখন বুঝতে চেষ্টা করা যাক।

প্রথম দায়িত্ব - ঐক্যবদ্ধ হও। আল্লাহ যে সব প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন কোরে এই মহাসৃষ্টি কোরেছেন তার একটি হোল **ঐক্য অনৈক্যের চেয়ে শক্তিশালী।** দশজন ঐক্যবদ্ধ লোক একশ' ঐক্যহীন লোকের চেয়ে শক্তিশালী। কোন জাতি বা রাষ্ট্র যদি জনসংখ্যায় অস্ত্রশস্ত্র, সম্পদে মহাশক্তিধরও হয় কিন্তু যদি সেটার মধ্যে ঐক্য না থাকে তবে সেটা অনেক কম শক্তির শত্রুর কাছে পরাজিত হবে। এ সত্য চিরন্তন এবং যে কোন জাতি, রাষ্ট্র, গোত্র, এমনকি একটি পরিবারের জন্যও সত্য। সমস্ত পৃথিবীতে এই দীনুল এসলামকে প্রতিষ্ঠার মত বিরাট কাজ **ঐ ঐক্য ছাড়া মোটেই সম্ভব নয়।** তাই আল্লাহ তাঁর কোর'আনে এই ঐক্য এই উম্মাহর মধ্যে অটুট রাখার জন্য বারবার বোলেছেন। সুরা আল এমরানের ১০৩ নং আয়াতে বোলেছেন- ঐক্যবদ্ধ হোয়ে আল্লাহর রজ্জু (হেদায়াহ, দীন) ধোরে রাখতে, বিচ্ছিন্ন না হোতে; সুরা আস্ সফ-এর ৪ নং আয়াতে আমাদের আদেশ কোরছেন গলিত সীসার দেয়ালের মত ঐক্যবদ্ধ হোয়ে জেহাদ কোরতে। গলিত সীসার দেয়ালে একটি সূঁচ ঢোকার জায়গাও থাকে না। যাদের কাজে, কথায় ঐক্য নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে তাদের জন্য রেখেছেন কঠিন শাস্তি, আযাব কোর'আনের বহু স্থানে। যে সব কাজে ও কথায় উম্মাহর ঐক্য নষ্ট হবার সম্ভাবনা আছে সে সব কাজকে আল্লাহর রসুল সরাসরি কুফর বোলে আখ্যায়িত কোরেছেন।

দ্বিতীয় দায়িত্ব - (নেতার আদেশ) শোন। যে জাতির ওপর আল্লাহ এবং জাতির প্রতিষ্ঠাতা এই দায়িত্ব অর্পণ কোরেছেন যে পৃথিবীতে চালু সমস্ত রকম জীবন-ব্যবস্থা (দীন) সংগ্রাম ও সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে পরাজিত ও বাতিল কোরে দিয়ে শেষ রসুলের মাধ্যমে প্রেরিত হেদায়াহ ও সত্যদীনকে প্রতিষ্ঠা কোরে মানব জাতির মধ্যকার সমস্ত অন্যায়, অবিচার, রক্তপাত বন্ধ কোরে, এবলিসের চ্যালেঞ্জে আল্লাহকে জয়ী কোরতে হবে, সে জাতিকে অবশ্যই **সর্বদাই ঐ দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন ও সজাগ থাকতে হবে।** সে জাতির লোকজন তাদের রুজি রোজগার জীবিকা

(Profession) নিয়ে যতোই ব্যস্ত থাকুক, অতন্দ্র প্রহরীর মত তাদের কান পেতে থাকতে হবে কখন তাদের নেতা কি আদেশ করেন, কি নির্দেশ দেন।

তৃতীয় দায়িত্ব - (নেতার ঐ আদেশ) পালন করো । আদেশ শোনার পর আল্লাহর রসুল নির্দেশ কোরছেন কোন দ্বিধা না কোরে সঙ্গে সঙ্গে তা পালন কোরতে, কার্য্যকর কোরতে। কারণ জাতির বা সংগঠনের ঐক্য যতোই সুদৃঢ় হোক, আনুগত্য ও শৃংখলাও ঐ ঐক্যের মতই সুদৃঢ় না হোলে ঐ ঐক্য অর্থহীন। ঐ ঐক্য দিয়ে কোন কাজ হবে না। এ নির্দেশ শুধু রসুলেরই নয়, এ নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহরও। তিনি তাঁর কোর'আনে মো'মেনদের, উম্মতে মোহাম্মদীকে আদেশ কোরেছেন- আল্লাহর আনুগত্য করো, তাঁর রসুলের আনুগত্য করো এবং তোমাদের মধ্য থেকে আদেশকারীর (নেতার) আনুগত্য করো (সুরা আন নেসা, আয়াত ৫৯)। আদেশকারীর অর্থ, সংগঠন বা জাতীর মধ্যে থেকে যিনি নেতা নিযুক্ত হবেন এবং আনুগত্য (এতায়াত) অর্থ দ্বিধাহীন ভাবে, আদেশের সঙ্গে সঙ্গে তা পূর্ণ ভাবে পালন করা, ঠিক যেভাবে নামাজের সময় এমামের (নেতার) তকবির অর্থাৎ আদেশের সঙ্গে সঙ্গে তা পালন কোরতে হয়। **এই আয়াতে আল্লাহ তাঁর নিজের প্রতি আনুগত্য, তাঁর রসুলের প্রতি আনুগত্য ও নেতার প্রতি আনুগত্যের মধ্যে কোন শর্ত্ত বা তফাৎ রাখেন নি;** একই লাইনে, একই বাক্যে (Sentence) এবং একই ধারাবাহিকতায় (Continuity) বোলে দিয়েছেন। আল্লাহর ঐ আদেশের প্রতিধ্বনি কোরে তাঁর রসুল বোলেছেন- যে আমার আনুগত্য ও আদশ পালন কোরলো সে আল্লাহর আনুগত্য ও আদেশ পালন কোরলো, যে আমার আনুগত্য ও আদেশ পালন কোরলো না, সে আল্লাহর আনুগত্য ও আদেশ পালন কোরলো না এবং যে আদেশকারীর (আমীর, নেতার) আনুগত্য ও আদেশ পালন কোরলো, সে আমারই আনুগত্য ও আদেশ পালন কোরলো, যে আদেশকারীর (আমীর, নেতার) আনুগত্য ও আদেশ পালন কোরলো না, সে আমারই আনুগত্যও আদেশ পালন কোরলো না (আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বোখারী)। তিনি আরও বোলেছেন- তোমরা তোমাদের নেতার আদেশ শ্রবণ কোরবে ও পালন কোরবে, যদিও সে ক্ষুদ্র মাথাওয়ালা কালো নিগ্রো কোন লোকও হয় (আনাস (রাঃ) থেকে- বোখারী)। দিনে পাঁচবার জামাতে নামায পড়ার আদেশের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্যও ঐ একই; এমামের অর্থাৎ নেতার আদেশ (তকবীর) শোনার সঙ্গে সঙ্গে তা পালন করার প্রশিক্ষণ। **জামাতে নামায পড়ার সময় এমামের তকবীরের আনুগত্য না কোরে নিজের ইচ্ছামত নামায পোড়লে যেমন নামায হবে না, নেতার আনুগত্য না কোরে নিজের ইচ্ছামত কাজ কোরলে সে কাজ**

পৃথিবীতে দীন প্রতিষ্ঠার কাজ হোলেও তা নষ্ট হোয়ে যাবে। আল্লাহর রসুলের দেয়া আনুগত্য ও শৃংখলার শিক্ষা তাঁর উম্মাহর হৃদয়ের মধ্যে এমন ভাবে প্রোথিত হোয়ে গিয়েছিলো যে তাঁর এন্তেকালের পর প্রথম সারির সাহাবা ও তাঁর অন্যতম প্রিয় অনুসারী আবু যর (রাঃ) তার প্রিয় নেতার সুন্নাহ পর্য্যন্ত অমান্য কোরলেন। কারণ হিসাবে বোললেন- আমার বন্ধু (আল্লাহর রসুল) বোলেছেন কানকাটা, নিগ্রো, ক্রীতদাসও যদি তোমাদের নেতা নিযুক্ত হয় তা হোলেও তোমরা তার আনুগত্য কোরবে (হাদীস- এরবাদ বিন সা'রিয়াহ (রাঃ) থেকে আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজাহ, মেশকাত)। তিনি (আল্লাহর রসুল) আরও বোলেছেন- **নেতার আদেশ যদি ভুল মনে হয় তবুও তা দ্বিধাহীন ভাবে পালন কোরবে। আদেশ ভুল হোলে নেতা সেজন্য দায়ী থাকবে, পালনকারী নয়।** নেতার আনুগত্যের ও শৃংখলার এই শিক্ষার ফলেই ওমর বিন খাত্তাবের (রাঃ) একটি আদেশে আল্লাহর তলোয়ার খালেদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ) মোসলেম বাহিনীর প্রধান সেনাপতির পদ ছেড়ে দিয়ে সাধারণ সৈনিকের লাইনে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ কোরতে লাগলেন; উমাইয়া খলিফা সুলায়মানের অন্যায় আদেশের কোন প্রতিবাদ না কোরে সিন্ধুবিজয়ী মহাবীর সেনাপতি মোহাম্মদ বিন কাসেম নিজেকে গ্রেফতার কোরিয়ে আরবে ফিরে গেলেন।

চতুর্থ দায়িত্ব - হেজরত করো। বর্ত্তমানের বিকৃত এসলামের বিকৃত আকীদার কারণে কর্মসূচির পাঁচটি দফার মধ্যে এই দফাটিই বোঝা এবং বোঝানো উভয়ই অতি কঠিন। মক্কার মোশরেক, কাফের ও অন্যান্য বিধর্মীরা যখন কিছুতেই আল্লাহর দীন ও তাঁর রসুলকে স্বীকার কোরলো না তখন আল্লাহর নির্দেশে বিশ্বনবী তাঁর আসহাবসহ মক্কা নগর ত্যাগ কোরে ইয়স্রেব শহরে প্রস্থান কোরলেন। এই কাজ বা ঘটনাকে বলা হয় হেজরত এবং ঐ সময় থেকেই হেজরী সন গণনা করা হোয়ে থাকে। প্রশ্ন হোতে পারে, পৃথিবীতে এই দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টায়, তরিকায় অর্থাৎ কর্মসূচিতে আল্লাহ হেজরত করাকে কেন অন্তর্ভুক্ত কোরলেন? বিশেষ অবস্থায় মহানবীকে দেশ ত্যাগ কোরতে হোয়েছিলো বোলে তাঁর উম্মাহর সবাইকেও ভবিষ্যতে তা কোরতে হবে, এটা কেমন কথা? হেজরতকে পরবর্ত্তী কালেও তাঁর উম্মাহর কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার বিশেষ কারণ আছে।

বর্ত্তমানে বিকৃত এসলামের অনুসারীদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা ও বিশ্বাস অর্থাৎ আকীদা হোচ্ছে এই যে, বিশ্বনবী মোহাম্মদ (দঃ) যাদের মধ্যে আবির্ভূত হোয়েছিলেন অর্থাৎ তদানিন্তন আরববাসীরা আল্লাহকে বিশ্বাস কোরতো না, তাদের আল্লাহর ওপর ঈমান ছিলো না। এই ধারণা সম্পুর্ণ ভুল।

তখনকার আরবরা বিশ্বাস কোরতো যে তারা আল্লাহর নবী এব্রাহীমের (আঃ) উম্মাহ। তারা নিজেদের 'হানীফ' বোলতো, হানীফ অর্থ তওহীদ এবং এব্রাহীমের (আঃ) একাগ্র অনুসারী। সুতরাং তদানিন্তন আরববাসীরা আল্লাহকে তেমনই বিশ্বাস কোরতো যেমন বর্ত্তমানের পৃথিবীময় মোসলেম বোলে পরিচিত লোকেরা এবং অন্যান্য ধর্মের লোকেরা বিশ্বাস করে। ঐ আরবরা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্ত্তা বোলে, পালনকারী বোলে বিশ্বাস কোরতো, নামাজ পোড়তো, কাবা শরীফকে আল্লাহর ঘর বোলে বিশ্বাস কোরতো, ঐ কাবাকে কেন্দ্র কোরে বাৎসরিক হজ্ব কোরতো, কোরবানী কোরতো, রোযা রাখতো, আল্লাহর নামে কসম কোরতো, এমনকি বর্ত্তমান সময়ের 'মোসলেমদের' মতো খাতনা ও কোরতো। শুধু তাই নয়, প্রয়োজনীয় দলিল, বিয়ে শাদীর কাবিন ইত্যাদি সমস্ত কিছু লেখার আগে আমরা যেমন বেসমেল্লাহ লেখি তেমনি তারাও আল্লাহর নাম লিখতো। তারা লিখতো বেসমেকা আল্লাহুম্মা, অর্থাৎ তোমার নাম নিয়ে (আরম্ভ কোরছি) হে আল্লাহ। নবুয়াত পাবার আগে মহানবীর সঙ্গে আম্মা খাদীজার (রাঃ) বিয়ের যে কাবিন লেখা হোয়েছিলো তা লিখেছিলো আরবের লোকেরা যাদের আমরা এখন কাফের মোশরেক বলি এবং তা তারা শুরু কোরেছিলো আল্লাহর নাম দিয়ে। তওহীদের ডাক দেবার 'অপরাধে' আল্লাহর রসুলকে তাঁর পরিবার পরিজন ও আসহাবসহ মক্কার বাইরে উত্তপ্ত উপত্যকায় নির্বাসন দেবার জন্য যে বিজ্ঞপ্তি মোশরেক কোরায়েশ নেতারা সর্বসাধারণের জানার জন্য পবিত্র কাবার দরজার ওপর ঝুলিয়ে দিয়েছিলো সে বিজ্ঞপ্তির প্রথমেই তারা লিখেছিলো- বেসমেকা আল্লাহুম্মা। হুদায়বিয়ার সন্ধিপত্র লেখার সময় আলী (রাঃ) যখন 'বেসমেল্লাহের রহমানের রহিম' দিয়ে আরম্ভ কোরলেন তখন মোশরেক কোরায়েশদের প্রতিনিধি সুহায়েল বিন্ আমর প্রতিবাদ কোরে বোললো, আমরা এ রকম কোরে লেখি না, আমরা যে ভাবে আল্লাহর নাম লেখি ঐ ভাবে লিখতে হবে, অর্থাৎ বেসমেকা আল্লাহুম্মা। তখন আল্লাহর রসুলের আদেশে আলী (রাঃ) ঐ ভাবেই লিখলেন। এগুলো ঐতিহাসিক প্রমাণ। আরবের মোশরেকরা যে আমাদের মতই আল্লাহয় বিশ্বাসী ছিলো এ কথায় সাক্ষ্য স্বয়ং আল্লাহ। কোর'আনে তিনি তাঁর রসুলকে বোলছেন- তুমি যদি তাদের (আরবের মোশরেক, কাফের অধিবাসীদের) জিজ্ঞাসা করো, আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি কোরেছেন? তবে তারা অবশ্যই জবাব দেবে- সেই সর্বশক্তিমান, মহাজ্ঞানী (আল্লাহ) (কোর'আন- সুরা যুখরুফ- ৯)। অন্যত্র বোলেছেন- তুমি যদি তাদের প্রশ্ন করো আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি কোরেছেন এবং কে সূর্য্য ও চন্দ্রকে তাদের (কর্ত্তব্য কাজে) নিয়োজিত ও নিয়ন্ত্রণ কোরছেন, তবে তারা নিশ্চয়ই জবাব দেবে- আল্লাহ

(কোর'আন- সুরা আনকাবুত- ৬১)। আল্লাহ আবার বোলছেন- যদি তাদের প্রশ্ন করো, কে এই মহাকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি কোরেছেন, তবে তারা নিশ্চয়ই জবাব দেবে আল্লাহ (কোর'আন- সুরা লোকমান- ২৫)। আল্লাহ তাঁর নবীকে আবার বোলছেন ঐ মোশরেকদের প্রশ্ন কোরতে (পানির অভাবে শুকিয়ে, ফেটে যেয়ে) মাটি যখন মরে যায়, তখন আকাশ থেকে পানি বর্ষণ কোরে কে তাকে পুণর্জীবন দান করেন- তবে তারা অবশ্যই জবাব দেবে- আল্লাহ (কোর'আন- সুরা আনকাবুত- ৬৩)। ইতিহাস ও আল্লাহর সাক্ষ্য, দু'টো থেকেই দেখা যায় যে, **যে মোশরেকদের মধ্যে আল্লাহর রসুল প্রেরিত হোলেন তারা আল্লাহকে গভীর ভাবে বিশ্বাস কোরতো অর্থাৎ আল্লাহর ওপর তাদের ঈমান ছিলো।** তারা হাবল লা'ত, মানাতের পূজা কোরতো ঠিকই কিন্তু ওগুলোকে তারা আল্লাহ বোলে বিশ্বাস কোরতো না, ওগুলোকে স্রষ্টা বোলেও মানতো না। তারা বিশ্বাস কোরতো যে হাবল, লা'ত, মানাত, ওজ্জা এরা দেব-দেবী, যারা ওগুলোকে মানবে, পূজা কোরবে তাদের জন্য ঐ দেব-দেবীরা সেই আল্লাহর কাছেই সুপারিশ কোরবে (কোর'আন- সুরা ইউনুস- ১৮, সুরা যুমার ৩)।

এখন বিরাট প্রশ্ন হল এই যে- আল্লাহর কোর'আন মোতাবেকই তদানিন্তন আরবের অধিবাসীরা যদি আল্লাহয় বিশ্বাসী হয়, ইতিহাস যদি সাক্ষ্য দেয় যে তারা কাবাকে আল্লাহর ঘর বোলে বিশ্বাস কোরতো, কাবার দিকে মুখ কোরে নামায পড়তো, রোযা রাখতো, সেই ঘরে এসে হজ্ব কোরতো, কোরবানী কোরতো, আল্লাহর নামে কসম কোরতো, প্রতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ আল্লাহর নামে আরম্ভ কোরতো, তবে তাদের মধ্যে নবী পাঠিয়ে তাদের হেদায়েত করার প্রয়োজন হোল কেন? এ প্রশ্নের জবাব হোচ্ছে এই যে, আরবের মোশরেক অধিবাসীরা আল্লাহকে খুবই বিশ্বাস করতো, আজ যেমন আমরা কোরি, কিন্তু আল্লাহর দেয়া দীন, জীবন-বিধান মোতাবেক তাদের সমষ্টিগত জাতীয় জীবন পরিচালনা কোরতো না। তাদের সামাজিক, জাতীয়, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, দণ্ডবিধি এ সমস্তই পরিচালিত হতো হাবল, লা'ত, মানাত ও ওজ্জার কোরায়েশ পুরহিতদের তৈরী করা আইন-কানুন ও নিয়ম দিয়ে। তারা বুঝতো না যে আল্লাহকে যতোই বিশ্বাস করা হোক, ব্যক্তিগতভাবে যতোই কঠিন এবাদত করা হোক, যতোই তাক্ওয়া করা হোক, জাতীয় জীবন আল্লাহর দেওয়া দীন, আইন- কানুন, দণ্ডবিধি অর্থনীতি দিয়ে পরিচালিত না হোলে সেটা আল্লাহর তওহীদ হবে না, সেটা হবে শের্ক ও কুফর। **কাজেই আল্লাহর ওপর ও এব্রাহীমের (আঃ) নবুওতের ওপর পূর্ণ ঈমান থাকলেও, কাবাকে আল্লাহর ঘর বোলে বিশ্বাস কোরলেও, সেই কাবার দিকে মুখ**

কোরে নামায পোড়লেও, হজ্ব কোরলেও, কাবাকে তওয়াফ কোরলেও, আল্লাহর রাস্তায় কোরবাণী কোরলেও, রমাদান মাসে রোযা রাখলেও, খাতনা কোরলেও, প্রতি কাজ আল্লাহর নাম নিয়ে আরম্ভ কোরলেও আরবরা মোশরেক ও কাফের ছিল। তাদের প্রকৃত তওহীদে সর্বব্যাপী তওহীদে আনার জন্যই আল্লাহর রসুল প্রেরিত হোয়েছিলেন। একইভাবে বর্ত্তমানে 'মোসলেম' বোলে পরিচিত জনসংখ্যাটি তদানিন্তন আরবের মানুষের মতই আল্লাহকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে, তাকে স্রষ্টা বোলে, জীবন-মরণের প্রভু বোলে মানে, কিন্তু আরবের ঐ মোশরেকদের মতই তাঁর (অর্থাৎ আল্লাহর) দেয়া দীন, জীবন-বিধান মোতাবেক সমষ্টিগত, জাতীয় জীবন পরিচালনা করে না। **আরবের মোশরেকরা দেব-দেবীর পুরোহিতদের দেয়া বিধান অনুযায়ী তাদের জাতীয় জীবন পরিচালনা কোরতো, বর্ত্তমানের মোসলেম দুনিয়া নতুন দেব-দেবী গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্ম-নিরপেক্ষতা, রাজতন্ত্র, একনায়কতন্ত্রের পুরোহিত ইহুদী-খ্রীস্টানদের তৈরী করা জীবন-বিধান অনুযায়ী তাদের জাতীয় জীবন পরিচালনা কোরছে।** তফাৎ শুধু এইটুকু যে আরবদের হাবল, লা'ত, মানাতের মূর্ত্তিগুলি ছিল কাঠ এবং পাথর দিয়ে তৈরী, বর্ত্তমানের মূর্ত্তিগুলি কাঠ পাথরের নয়, তন্ত্রের মূর্ত্তি। বরং এই **তন্ত্রের মূর্ত্তিগুলোর পুজা ঐ কাঠ পাথরের মূর্ত্তিপূজার চেয়েও বড় শের্ক ও কুফর।** কারণ লা'ত, মানাতের পূজা করা হতো আল্লাহর কাছে পুজারীদের জন্য সুপারিশ করার জন্য, এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য (তারা বলে, 'এইগুলি আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী' কোর'আন- সুরা ইউনুস- ১৮। আমরা তো এদের পূজা এইজন্যই কোরি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্য এনে দিবে, কোর'আন- সুরা যুমার- ৩)। কিন্তু বর্ত্তমানে যে তন্ত্রগুলির পূজা করা হোচ্ছে এই তন্ত্রগুলির আল্লাহর সাথে কোন সম্পর্ক নেই বরং এগুলো আল্লাহর বিরোধী, আল্লাহর ভাষায় তাগুত। তাহোলে বিশ্বনবী যাদের মধ্যে আবির্ভুত হোয়েছিলেন আরবের সেই আল্লাহয় বিশ্বাসী অথচ মোশরেক কাফেরদের সঙ্গে বর্ত্তমানের আল্লাহয় বিশ্বাসী কিন্তু কার্য্যত মোশরেক 'মোসলেম' জনসংখ্যার তফাৎ কোথায়? **আল্লাহর ওপর ঈমান নিয়েও যে মোশরেক হওয়া যায় তার প্রমাণ কোর'আন, সুরা ইউসুফ আয়াত ১০৬।**

হেজরত শব্দের অর্থ শুধু দেশ ত্যাগ করা নয়। হেজরত ক্রিয়াপদের অর্থঃ- "সম্পর্কচ্ছেদ করা, দল বর্জন করা, স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া ভিন্নদেশে গমন করা" (সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ, দ্বিতীয় খন্ড, পৃঃ ৫৬০-৬১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন)। আল্লাহয় বিশ্বাসী অথচ মোশরেক ঐ আরবদের

মধ্যে আবির্ভূত হোয়ে বিশ্বনবী যখন প্রকৃত তওহীদের ডাক দিলেন তখন যারা প্রকৃত তওহীদ কী, তা বুঝে আল্লাহর রসুলকে স্বীকার কোরে তাঁর সাথে যোগ দিলেন তারা আরবদের ঐ শের্ক ও কুফর থেকে হেজরত কোরলেন। মক্কা থেকে শারীরিক হেজরত কোরে মদীনায় চোলে যাবার আগে পর্য্যন্ত আল্লাহর রসুল ও তাঁর আসহাব প্রথম দুই প্রকারের হেজরত কোরলেন। তারা মোশরেক কাফেরদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য, ওঠা-বসা সবই কোরতেন কিন্তু তাদের মধ্যে বাস কোরেও হৃদয়ের দিক থেকে তাদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ কোরলেন, তাদের দল বর্জন কোরলেন, তাদের সাথে এবাদত করা ছেড়ে দিলেন এবং আল্লাহর রসুলকে কেন্দ্র কোরে **তওহীদ ভিত্তিক একটি আলাদা সমাজ, আলাদা ভ্রাতৃত্ব গড়ে তুললেন।** তারপর ১৩ বছর পর মক্কা থেকে মদীনায় চোলে যেয়ে তৃতীয় প্রকার হেজরত কোরলেন। এর ৯ বছর পর মক্কা জয়ের পর তৃতীয় প্রকারের হেজরতের আর প্রয়োজন রোইলো না, কিন্তু বাকী দুই প্রকারের হেজরতের প্রয়োজন রোয়ে গেলো এবং আজও আছে। দীন যখনই বিকৃত হোয়ে যাবে, বৃহত্তর জনসংখ্যা যখনই ঐ বিকৃত দীনের ভ্রান্ত পথে চোলবে, তখন আল্লাহ তাঁর অসীম করুণায় যাদের সেরাতুল মুস্তাকীমে হেদায়াত কোরবেন, তাদের ঐ বৃহত্তর জনসংখ্যা থেকে বিশ্বনবী ও তাঁর সাহাবাদের (রাঃ) মতই হেজরত কোরতে হবে। অর্থাৎ ঐ সংখ্যাগরিষ্ঠ পথভ্রান্তদের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ও তাদের দল বর্জন কোরতে হবে। এ হেজরতের প্রয়োজন কোনদিনই শেষ হবে না। **চৌদ্দশ' বছর আগে আল্লাহয় বিশ্বাসী আরবের মোশরেকদের মধ্যে মহানবী ও তাঁর আসহাবদের (রাঃ) যে ভূমিকা ছিলো, আজ আল্লাহ বিশ্বাসী কিন্তু কার্য্যতঃ মোশরেক সমাজের মধ্যে হেযবুত তওহীদের সেই ভূমিকা।** সেদিন আল্লাহর রসুল যেমন মানুষকে আল্লাহর প্রকৃত তওহীদে, সর্বব্যাপী তওহীদে আহ্বান কোরেছিলেন, সেই নবীর প্রকৃত উম্মাহ হিসাবে হেযবুত তওহীদ সেই একই আহবান কোরছে। সেদিন আল্লাহর রসুল ও তাঁর সাহাবারা (রাঃ) যেমন দীনের ব্যাপারে ঐ সমাজ থেকে হেজরত কোরেছিলেন, তাদের সাথে এবাদত করা ছেড়ে দিয়েছিলেন, আজ ঠিক তেমনি ভাবে প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদী হবার প্রচেষ্টারত হেযবুত তওহীদকেও বর্ত্তমান 'মোসলেম' সমাজ থেকে হেজরত কোরতে হবে। নইলে নবীর সুন্নাহ পালন করা হবে না, এবং এই দীনুল এসলামকে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আল্লাহর রসুলের সুন্নাহ ত্যাগ কোরলে আল্লাহর সাহায্য ও সাফল্য আসবে না। আল্লাহর রসুল বোলেছেন - হেজরত শেষ হবে না যে পর্য্যন্ত তওবা শেষ হবে না, তওবা শেষ হবে না যে পর্য্যন্ত সূর্য্য তার অস্ত যাবার স্থান থেকে উদয় না হবে [মুয়াবিয়া (রাঃ) থেকে আহমদ, আবু দাউদ

ও দারিমী]। কেয়ামতের একটি আলামত হোচ্ছে পশ্চিম থেকে সূর্য্যোদয়। তারপর থেকে আর কারো তওবা কবুল হবে না। অর্থাৎ হেজরতের প্রয়োজন কেয়ামত পর্য্যন্ত থাকবে, যেমন থাকবে জেহাদেরও প্রয়োজন কেয়ামত পর্য্যন্ত (হাদীস)।

পঞ্চম দায়িত্ব - আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করো। **এই শেষ দায়িত্বই হোল পেছনের চারটি দায়িত্বের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।** এটাকে বাদ দিয়ে ঐ চারটির আর কোন অর্থ নেই। একটি সংবিধান (Constitution), সেটি যতো সুন্দর, যতো নিখুঁতই হোক না কেন, সেটা একটা জনসমষ্টি বা জাতির ওপর প্রয়োগ ও কার্য্যকর না কোরলে যেমন সেটা অর্থহীন, **তেমনি তওহীদের ওপর ভিত্তি করা দীনুল এসলাম, দীনুল হকের সংবিধান "কোর'আনকে" মানব জীবনের সর্বস্তরে, সর্ব অঙ্গনে কার্য্যকর না কোরতে পারলে তা অর্থহীন।** এই সংবিধানকে প্রয়োগ ও কার্য্যকর করার নীতি পদ্ধতি আল্লাহ নির্দিষ্ট কোরে দিয়েছেন- জেহাদ ও কেতাল- সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও সশস্ত্র সংগ্রাম (কোর'আন- সুরা বাকারা- ২১৬ ও অন্যান্য বহু আয়াত)। **তাই মো'মেনদের অর্থাৎ প্রকৃত বিশ্বাসীদের সংজ্ঞাকে আল্লাহ শুধু সর্বব্যাপী তওহীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন নি, ঐ তওহীদকে প্রতিষ্ঠা ও কার্য্যকর করার জন্য জেহাদকেও অন্তর্ভুক্ত কোরে দিয়েছেন।** বোলেছেন- শুধু তারাই সত্যনিষ্ঠ মো'মেন যারা আল্লাহ ও তার রসুলকে বিশ্বাস কোরেছে, তারপর আর তাতে কখনও সন্দেহ করে নি এবং তাদের জান ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ কোরেছে (কোর'আন- সুরা হুজরাত- ১৫)। অর্থাৎ **শুধু প্রকৃত তওহীদে** (বর্ত্তমানের বিকৃত ও আংশিক তওহীদ নয়, জীবনের সর্ব অঙ্গনের তওহীদ) **বিশ্বাসী হোলেও কেউ প্রকৃত মো'মেনের সংজ্ঞায় স্থান পাবে না, যদি সে ঐ তওহীদকে মানব জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম না করে।** তাই আল্লাহ কোর'আনে জেহাদ (সর্বাত্মক সংগ্রাম) ও কেতালকে (সশস্ত্র সংগ্রাম, যুদ্ধ) কয়েক শতবার উল্লেখ কোরেছেন এবং তার রসুল বোলেছেন- যে ব্যক্তি জেহাদ কোরলো না বা জেহাদ করার দৃঢ় সংকল্প কোরলো না সে মোনাফেকদের একটি শ্রেণীভুক্ত অবস্থায় মারা গেল [হাদীস- আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে- মোসলেম, মেশকাত]। মোনাফেকদের স্থান মোশরেক ও কাফেরদের স্থানের চেয়েও নিচে জাহান্নামের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর স্থানে (কোর'আন- সুরা আন নেসা- ১৪৫)। তাই আল্লাহর রসুল দীনুল এসলামকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্য মাত্র নয় বছরের মধ্যে ১০৭ টি যুদ্ধ কোরেছেন। এটাই তার সেই প্রকৃত সুন্নাহ যে

সুন্নাহ পালন না কোরলে তিনি বোলেছেন- আমি তাদের কেউ নই, তারা আমার কেউ নয়, অর্থাৎ আমার উম্মত নয়।

নিজের উম্মাহর ওপর এই পাঁচটি কাজের দায়িত্ব, অর্থাৎ পাঁচ দফার একটি কর্মসূচি অর্পণ কোরে আল্লাহর রসুল বোলেছেন- এই কর্মসূচির ঐক্যবন্ধনী থেকে যে আধহাত পরিমাণও সোরে যাবে সে তার গলা থেকে এসলামের রজ্জু (বন্ধন) খুলে ফেলবে- যদি না সে আবার (তওবা কোরে) ফিরে আসে- আর যে অজ্ঞানতার যুগের (আইয়্যামে জাহেলিয়াত) কোন কিছুর দিকে আহ্বান কোরবে, সে যদি নিজেকে মোসলেম বোলে বিশ্বাস করে এবং নামায পড়ে এবং রোযা রাখে তবুও সে জাহান্নামের জ্বালানী পাথর হবে। এখানে আইয়্যামে জাহেলিয়াত, অজ্ঞানতার যুগ বোলে বোঝানো হোয়েছে প্রাক-এসলামী যুগের কথা। অর্থাৎ আল্লাহর শেষ রসুলের নবুয়াত পাবার আগের সময়ের কথা, যে সময় আল্লাহকে বিশ্বাস কোরেও মোশরেকরা তাদের জীবন, বিশেষ কোরে সমষ্টিগত সামাজিক জীবন পরিচালিত কোরতো আল্লাহর দীন দিয়ে নয়, কাবার পুরোহিতদের, গায়রুল্লাহর বিধান, আইন-কানুন দিয়ে; আজ যেমন **আল্লাহকে বিশ্বাস কোরেও আমাদের সমষ্টিগত, জাতীয় জীবন আল্লাহর দেয়া বিধান, আইন-কানুন দিয়ে পরিচালিত হয় না, হয় ইহুদী-খ্রীস্টানদের, গায়রুল্লাহর আইন-কানুন, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি দিয়ে।** অর্থাৎ ঐ আইয়্যামে জাহেলিয়াত, অজ্ঞানতার যুগ ও আজকের এই সময় একই কথা। আজ যদি একদল লোক এই জাহেলিয়াত ও শের্ক থেকে মহানবী ও তার সাহাবাদের (রাঃ) মত হেজরত কোরে আল্লাহর প্রকৃত, সর্বব্যাপী তওহীদে ফিরে এসে একজন নেতার অধীনে ঐক্যবদ্ধ হোয়ে একটি সংগঠন করে তবে ঐ সংগঠন থেকে কেউ যদি অজ্ঞানতার সময়ের কোন কিছুকে আবার গ্রহণ কোরতে বলে তবে সে জাহান্নামের জ্বালানী। উদাহরণ - অজ্ঞানতার যুগে সমাজে সুদ প্রচলিত ছিলো। দীনুল এসলাম প্রতিষ্ঠিত হোলে আল্লাহ ঐ সুদকে শুধু যে নিষিদ্ধ কোরলেন তাই নয়, সুদ যারা চালু রাখবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যোষণা কোরলেন (কোর'আন - সুরা আল বাকারা- ২৭৯)। সেই সুদ আজ সমস্ত 'মোসলেম' দুনিয়ার জাতীয় অর্থনীতির বুনিয়াদ। শের্ক, কুফর থেকে হেজরত কোরে আল্লাহর ও রসুলের দেয়া ৫ দফা কর্মসূচির ঐক্যবন্ধনের মধ্যে থেকেও কেউ যদি বলে- সমস্ত পৃথিবীতে বর্ত্তমানে সুদ ভিত্তিক অর্থনীতি চালু আছে, ঐ অর্থনীতি থেকে সম্পুর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হোয়ে যাওয়া বাস্তবতা নয়, সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা সম্ভব নয়, কাজেই এটাকে আংশিক ভাবে বা অস্থায়ীভাবে চালু রাখা যাক, তবে ঐ লোক এই ৫ দফা কর্মসূচির মধ্যে থাকলেও, সে নিজেকে মোসলেম বোলে

বিশ্বাস কোরলেও, নামায পড়লেও, রোযা রাখলেও (অর্থাৎ সর্বরকম এবাদত কোরলেও) সে জাহান্নামের জ্বালানী পাথর। সুদ ছাড়াও বর্ত্তমানের গায়রুল্লাহর অন্যান্য বিষয়েও ঐ একই কথা প্রযোজ্য।

এই কর্মসূচিটিকে একটু পর্য্যবেক্ষণ কোরলেই বোঝা যায় যে, **এটি সম্পুর্ণভাবে একটি সামরিক কর্মসূচি।** যে কোন সামরিক বাহিনীর কর্মসূচির সঙ্গে এটাকে তুলনা কোরলেই এ সত্য প্রকট হোয়ে উঠবে। প্রত্যেক সামরিক বাহিনীর মূলনীতিই হোল- ঐক্য, শৃংখলা, আনুগত্য ও যুদ্ধ। আল্লাহর দেয়া কর্মসূচিতে শুধু হেজরতটা অতিরিক্ত। কিন্তু চিন্তা কোরলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর সব সামরিক বাহিনীগুলিও আংশিকভাবে হেজরত করে। তারা দেশের জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হোয়ে ব্যারাকে অর্থাৎ সামরিক ঘাঁটিতে বাস করে, যেখানে তাদের জীবনযাত্রা জনসাধারণ থেকে সম্পুর্ণভাবে অন্যরকম। ব্যারাকের জীবনযাত্রার নিয়মে গণতন্ত্রের নামগন্ধও নেই, আল্লাহর দেয়া এই কর্মসূচিতেও গণতন্ত্রের নামগন্ধ নেই; এখানে শুধু সুদৃঢ় ঐক্য, শৃংখলা, আনুগত্য, গায়রুল্লাহ থেকে হেজরত ও যুদ্ধ। **'এ ইসলাম ইসলামই নয়'** বইয়ে আমি লিখেছি- **আল্লাহর নির্দেশে তার রসুল যে উম্মাহ, যে জাতি গঠন কোরলেন সেটাকে একটি জাতি না বোলে বরং একটি সামরিক বাহিনী বলাই যথার্থ হয়।** কারণ যে জনগোষ্ঠি ৯ বছরের মধ্যে ১০৭ টি যুদ্ধ কোরলো, যার প্রতিষ্ঠাতা নেতা থেকে শুরু কোরে প্রত্যেকটি মানুষ অজেয় যোদ্ধা হোল, নেতা থেকে নিয়ে প্রত্যেকটি লোকের গায়ে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন পড়লো, সে জনগোষ্ঠিকে সামরিক বাহিনী ছাড়া অন্য আর কি নামে অভিহিত করা যায়? আল্লাহর দেয়া কর্মসূচিটি আমার এই কথারই সত্যায়ন।

আল্লাহ মানব জাতিকে ন্যায়, সুবিচার ও শান্তিতে (এসলামে) পৃথিবীতে থাকার জন্য পাঁচ দফার একটি দীন দিলেন (তওহীদ, নামায, যাকাত, হজ্ব ও রোযা) এবং ঐ দীনকে পৃথিবীতে মানব জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্যও ঐ পাঁচ দফার একটি কর্মসূচি তার রসুলের মাধ্যমে দিলেন (ঐক্য, আদেশ শোনা, আদেশ পালন করা, হেজরত ও সর্বাত্মক সংগ্রাম করা)। যেহেতু ঐ দীন মানব জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হোলে ঐ দীনের মূল্য নেই, **সেহেতু দীন প্রতিষ্ঠার ঐ ৫ দফা কর্মসূচিটি ৫ দফা বিশিষ্ট দীনের সমান গুরুত্বপূর্ণ, সমান মূল্য।** এ কথাটা ভালো কোরে বোঝার জন্য একটি অনুচিত্র পেশ কোরছি।

১ **হেদায়াহ ও সত্য দীন**	২ **হেদায়াহ ও সত্যদীনকে প্রতিষ্ঠা**
তিনি (আল্লাহ) তার রাসুলকে (দঃ) হেদায়াহ ও সত্যদ্বীন দিয়ে প্রেরণ কোরেছেন	এই জন্য যে তিনি যেন এটাকে অন্য সমস্ত দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠা করেন। (কোরআন- সুরা আল ফাতাহ, আয়াত- ২৮, সুরা আত তওবা, আয়াত- ৩৩ ও সুরা আস সফ, আয়াত-৯)
সত্যনিষ্ঠ মো'মেন শুধু তারা যারা আল্লাহ ও তার রাসুলকে বিশ্বাস কোরেছে, তাতে আর সন্দেহ করে নাই	এবং তাদের প্রাণ ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ কোরেছে। (কোরআন - সুরা আল হুজরাত, আয়াত ১৫)
ক) আল্লাহ ও রাসুলের ওপর ইমান- (তওহীদ)	ক) ঐক্য
খ) সালাত (নামায)	খ) (নেতার আদেশ)- শোনা
গ) যাকাত	গ) (ঐ আদেশ)- পালন করা
ঘ) হজ্ব	ঘ) হেজরত করা
ঙ) সওম (রোযা)	ঙ) আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা

১ নং ছক হোচ্ছে আল্লাহর তওহীদ ভিত্তিক শেষ দীনুল এসলাম আর ২নং ছক হোচ্ছে সেই দীনকে প্রতিষ্ঠা করার প্রক্রিয়া, তরিকা, কর্মসূচি। ১ নং না থাকলে ২ নং এর কোন প্রয়োজন নেই এবং ২ নং না থাকলে ১ নং অর্থহীন। একটি অন্যটির পরিপূরক। **সুতরাং দু'টোরই মূল্য, গুরুত্ব একই সমান। ১ নং ছকের পাঁচ দফার যে কোন একটাকে বাদ দিলে বা অস্বীকার কোরলে যেমন মো'মেন বা মোসলেম থাকা যায় না, তেমনি ২ নং ছকের পাঁচদফার যে কোন একটিকে অস্বীকার কোরলে বা এ থেকে আধ হাত মাত্র সোরে গেলেই গলা থেকে এসলামের বাঁধন খুলে ফেলা হোল।** এসলামের বাঁধন গলা থেকে খুলে ফেলা অর্থ দীন থেকে বের হোয়ে যাওয়া, মোশরেক কাফের হোয়ে যাওয়া। আল্লাহর রসুলের ৬০/৭০ বছর পর থেকেই ঐ ২নং ছক (কর্মসূচি) সম্পুর্ণ ভাবে পরিত্যক্ত হোয়েছে। ১ নং ছকের প্রথম দফা তওহীদও আর প্রকৃত তওহীদ নেই, ওটা ব্যক্তিগত অর্থাৎ আংশিক তওহীদে পরিণত হোয়েছে। আংশিক তওহীদ অবশ্যই শের্ক, যে শের্ক ক্ষমা না করার জন্য আল্লাহ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ঐ আংশিক তওহীদের কারণে পরের দফাগুলি অর্থাৎ নামায, যাকাত ইত্যাদিও অর্থহীন হোয়ে গেছে। আল্লাহ ও তার

রসুল চান যে তার এই উম্মাহ একটি কেন্দ্র, একজন নেতার অধীনে ঐক্যবদ্ধ থাকে (কোর'আন-সুরা সফ- ৪)। **এই ঐক্যের বন্ধনের বাইরে যেন একটিও মানুষ না থাকে সে জন্য বিশ্বনবী বোলেছেন- যে ব্যক্তি এমামের (নেতার) বায়াত (আনুগত্য) না নিয়ে মারা গেলো সে আইয়্যামে জাহেলিয়াতের (অজ্ঞতার যুগের) মৃত্যুবরণ কোরলো।** [হাদীস-মুয়াবিয়া (রাঃ) থেকে - মুসনাদে আহমদ ইবনে হাম্বল, চতুর্থ খন্ড, পৃষ্ঠা-৯৬]।

এখন প্রশ্ন হোচ্ছে- বর্ত্তমান দুনিয়ার শের্ক ও কুফর থেকে হেজরত কোরে কোথায় ঐক্যবদ্ধ হোতে হবে? দীনুল এসলামকে প্রতিষ্ঠা কোরতে প্রচেষ্টা কোরছে, পৃথিবীতে এমন বহু সংগঠন আছে। এই সব সংগঠন, দলগুলির প্রত্যেকটির কর্মসূচি ঐ সংগঠনগুলির প্রতিষ্ঠাতাদের, নেতাদের অর্থাৎ মানুষের তৈরী। কাজেই এদের কোনটাই আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোথাও সাফল্য লাভ কোরতে পারে নাই। কিন্তু এই সব সংগঠনগুলির **কোনটি যদি তাদের নিজেদের তৈরী করা কর্মসূচি ত্যাগ কোরে আল্লাহর দেয়া এই কর্মসূচি গ্রহণ করে তবে সেই সংগঠনে যোগ দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হোতে হবে কি?** এর জবাবে আমি বোলবো- না, তা হবে না। কারণ হোচ্ছে এই যে, এই সংগঠনগুলি বহু বছর থেকে এই প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। কোন কোনটি ৫০/৬০ বছর ধোরে কাজ কোরছে কিন্তু এদের ভুল আকীদার কারণে এদের কোনটাকেই আল্লাহ তার নিজের তৈরী কর্মসূচি দেন নি। হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠার মাত্র এক বছরের মধ্যে রহমানুর রহিম যে কর্মসূচি তার রসুলকে তার উম্মাহর জন্য দিয়েছিলেন সেটা অলৌকিক ভাবে এই সংগঠনকে দিয়ে একে ধন্য কোরেছেন। **একটি সংগঠনের শৈশবেই আল্লাহর এতবড় অনুগ্রহ থেকেই প্রমাণ হয় যে এটাই তার মনোনীত সংগঠন।** তিনি চান এই সংগঠনের নেতৃত্বেই পৃথিবীর সমস্ত মো'মেন, মোসলেম ও উম্মতে মোহাম্মদী ঐক্যবদ্ধ হয় এবং পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠার জেহাদ করে। অন্যান্য সংগঠনগুলির দীর্ঘ জীবনে আল্লাহর দেয়া কর্মসূচি না পাওয়ায় নিজেদের তৈরী করা কর্মসূচি মোতাবেক কাজ কোরে ব্যর্থ হোয়ে বিপথগামী হোয়ে ইহুদী-খ্রীস্টানদের প্রক্রিয়া, তরিকা অবলম্বন কোরে মিটিং, মিছিল, শ্লোগান ও নির্বাচনের পথ ধোরেছে। কতকগুলি সংগঠন প্রথমে জেহাদ দিয়ে আরম্ভ কোরলেও নিজেদের তৈরী কর্মসূচির ফলে ব্যর্থ হোয়ে সেই নির্বাচনের পথই ধোরেছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোচ্ছে মিশরের এখওয়ানুল মোসলেমিন ও অতি সম্প্রতি ফিলিপাইনে নুর মিসওয়ারীর সংগঠন মোরো ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট (M.N.L.F)। কতকগুলি

সংগঠন জেহাদের কাছ দিয়েও যায় নি। ওগুলি প্রায় প্রথম থেকেই ইহুদী-খ্রীস্টানদের রাজনৈতিক তরিকা গ্রহণ কোরেছে; এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আলজেরিয়ার এসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট (F.I.S), উপমহাদেশের জামায়াতে এসলামী ও অনেক ছোট খাট দল। F.I.S নির্বাচনে জিতেও ক্ষমতায় যেতে না পেরে অন্য ভুল পথ ধোরেছে - সন্ত্রাসের পথ। এ পথও আল্লাহ রসুলের নয়, বিশ্বনবী এ পথে এসলাম প্রতিষ্ঠা করেন নি। রসুলের ওপর আল্লাহর অর্পিত এবং রসুল কর্তৃক তার উম্মাহর ওপর অর্পিত দায়িত্ব এই কর্মসূচি সুদীর্ঘ তেরশ' বছর পর আমি যে হেযবুত তওহীদের হাতে তুলে দিতে পারলাম এ জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাবার শক্তি আমার নেই। এ যে কতবড় দায়িত্ব, কতবড় নেয়ামত, হেযবুত তওহীদের প্রত্যেক মো'মেন, মোসলেম ও উম্মতে মোহাম্মদীকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি কোরতে হবে এবং সেই মোতাবেক তাদের জান ও মাল, জীবন ও সম্পদ দিয়ে আল্লাহর দীন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, জেহাদ কোরতে হবে। **প্রত্যেককে মনে রাখতে হবে যে, সংগ্রামই তার দায়িত্ব, সাফল্য নয়, কারণ সাফল্য ও ব্যর্থতা মানুষের হাতে নয়, সেটা আল্লাহর হাতে।** মানুষের প্রচেষ্টা, সংগ্রাম কতখানি আন্তরিকতার সাথে হোচ্ছে, কতখানি সবর, কতখানি কোরবানী করা হোচ্ছে সেটা দেখেই সেই মহামহীম, রাব্বুল আলা'মিন মানুষকে সাফল্য বা ব্যর্থতা দান করেন। তাঁর বিচারে অণুমাত্রও ভুল হয় না। তবে তিনি বোলেছেন- মো'মেনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব (কোর'আন-সুরা রুম, আয়াত ৪৭)। তাঁর সাহায্য আসলে পৃথিবীর কোন্ শক্তি আমাদের পরাজিত কোরবে? কারুর সে সাধ্য নেই। **তবে আমাদের সেই মো'মেন হোতে হবে যে মো'মেন হোলে আমাদের সাহায্য করা তাঁর দায়িত্ব হোয়ে যায় এবং মো'মেন হোচ্ছে সুরা হুজরাতের ১৫ নং আয়াতে আল্লাহ যে প্রকৃত মো'মেনের সংজ্ঞা দিয়েছেন সেই মো'মেন।** ইয়া আল্লাহ! তোমার অপার করুণায় তুমি হেযবুত তওহীদকে যেমন তোমার নিজের তৈরী কর্মসূচি দিয়ে ধন্য কোরেছো তেমনি তোমার অসীম স্নেহে একে কবুল কোরে নাও এবং একে তোমার কর্মসূচি অক্ষরে অক্ষরে পালন করার শক্তি দাও। হেযবুত তওহীদের প্রত্যেক মোজাহেদকে তোমার রসুলের সাহাবাদের মত শুধু মৃত্যুভয়হীন নয়, মৃত্যুর জন্য, শাহাদাতের জন্য আকুলপ্রাণ কোরে দাও।

- আমীন

জেহাদ, কেতাল ও সন্ত্রাস

এই ছোট্ট পুস্তিকাটি (Booklet) প্রকাশ হবার পর থেকে এ পর্য্যন্ত যে বিষয়টি লক্ষ করা গেলো তা হোচ্ছে এই যে মোসলেম বোলে পরিচিত এই জনসংখ্যার যে অংশটুকু এই দেশে আছে তাদের একাংশ হয় ভীত হোয়েছেন না হয় চিন্তিত হোয়ে পোড়েছেন। এই অংশটি হোচ্ছে জাতির সেই অংশ যেটা কিছুতেই আল্লাহ, রসুলের দীন প্রতিষ্ঠা হোক তা চায় না। তারা আমাদের জীবনে আল্লাহর দেয়া জীবন-ব্যবস্থা, দীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টাকে সন্ত্রাসী, জঙ্গীবাদ ইত্যাদি নাম দিয়ে মানুষের কাছে হেয় প্রতিপন্ন কোরতে চান। আমার এই বইয়ে যে জেহাদ, কেতাল ইত্যাদিকে সন্ত্রাস বোলে চিহ্নিত কোরতে চান। **জেহাদ আর সন্ত্রাস এক জিনিস নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়।** জেহাদ শব্দের অর্থ কোন কাজ কোরতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা; আর সন্ত্রাস হোচ্ছে হিংসাত্মক কাজ কোরে, বোমা ফাটিয়ে, ধ্বংস কোরে ভয়-ভীতি সৃষ্টি করা। কিন্তু মোসলেম নামধারী কিন্তু কার্য্যতঃ কাফের ও মোশরেক এই লোকগুলি জেহাদকে সন্ত্রাস বোলে চালিয়ে, জেহাদের বিরুদ্ধে মানসিকতা গড়ে তুলতে চান। অথচ দীন প্রতিষ্ঠার এই জেহাদ অর্থাৎ প্রচেষ্টা ছাড়া দীনুল এসলামই অসম্পূর্ণ; কারণ **ঈমানের সংজ্ঞার মধ্যে, মো'মেন হবার সংজ্ঞা, শর্ত্তের মধ্যেই আল্লাহ এই জেহাদ অর্থাৎ দীন প্রতিষ্ঠার এই প্রচেষ্টাকে, সংগ্রামকে ঢুকিয়ে দিয়ে রেখেছেন।** (দেখুন- সুরা হুজরাত, আয়াত ১৫)

যারা আমাদের জীবনে আল্লাহর দীনুল হক, এসলাম প্রতিষ্ঠা হোক তা চান না **তারা স্বভাবতই এই প্রচেষ্টাকে অর্থাৎ জেহাদকেও চান না,** এটাই স্বাভাবিক। তারা জেহাদ অর্থাৎ প্রচেষ্টাকে হেয়, মন্দ কাজ বোলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টায় একে সন্ত্রাসের সঙ্গে এক কোরে দিয়েছেন, যাতে সাধারণ মানুষ সন্ত্রাসকে ঘৃণার সাথে জেহাদকেও ঘৃণা করে। যেহেতু এসলাম বিরোধী এই লোকগুলির নিয়ন্ত্রনেই দেশের অধিকাংশ প্রচার ব্যবস্থা অর্থাৎ মিডিয়া (Media), সেহেতু তাদের অবিশ্রান্ত মিথ্যা প্রচারের ফলে তারা প্রায় সফলও হোয়েছেন। মোসলেম ও মো'মেন হবার দাবীদারও আজ নিজেকে কোন ভাবে জেহাদ অর্থাৎ দীনুল এসলাম প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত হবার কথা স্বীকার কোরতে ভয় পান এবং করেনও না।

সুতরাং প্রয়োজন হোয়ে পোড়েছে যে দীন প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় **জেহাদ এবং কেতালের স্থান কোথায় তা নির্দিষ্ট করা।** জেহাদ শব্দের অর্থ সংগ্রাম, সর্বাত্মক সংগ্রাম, প্রচেষ্টা। জেহাদ হোচ্ছে দীন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা মানুষকে মুখে বোলে, লিখে জানিয়ে, বক্তৃতা কোরে, যুক্তি উপস্থাপন কোরে, বুঝিয়ে ইত্যাদি ভাবে। আর কেতাল একেবারে ভিন্ন শব্দ যার অর্থ সশস্ত্র যুদ্ধ। **জেহাদ ব্যক্তি, দল, গোষ্ঠি ইত্যাদির পর্য্যায়ে এবং কেতাল রাষ্ট্রীয় পর্য্যায়ে।** কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠি বা দল যদি দীন প্রতিষ্ঠার জন্য অস্ত্র হাতে নেয় তবে সেটা হবে মারাত্মক ভুল। তাদের কাজ হবে মানুষকে যুক্তি দিয়ে কোরান-হাদীস দেখিয়ে, বই লিখে, বক্তৃতা কোরে মানুষকে এ কথা বোঝান যে পৃথিবীতে নিরংকুশ শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচারের মধ্যে বাস কোরতে হোলে একমাত্র পথ যিনি আমাদের সৃষ্টি কোরেছেন তাঁর দেয়া জীবন বিধান মোতাবেক আমাদের জীবন পরিচালনা করা। সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায় যে, যে যে জিনিস তৈরী কোরেছেন তাঁর চেয়ে আর কে জানবে যে জিনিসটি কিভাবে চালালে সেটা ঠিকমত, ভালোভাবে চোলবে। আল্লাহ সুরা মুলকের ১৪ নং আয়াতে বোলেছেন- যে সৃষ্টি কোরেছে তার চেয়ে বেশী জান? (তুমি সৃষ্ট হোয়ে?) এ যুক্তির কোন জবাব আছে? কিন্তু আমরা মো'মেন মোসলেম হবার দাবীদার হোয়েও দাজ্জালের নির্দেশে আল্লাহর দেয়া দীন, জীবন-ব্যবস্থা থেকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত অংশটুকু ছাড়া সমষ্টিগত (যেটাই প্রধান) অংশটুকু বাদ দিয়ে সেখানে নিজেরা বিধান, আইন-কানুন, নিয়মনীতি নির্দ্ধারণ কোরে সেই মোতাবেক আমাদের সমষ্টিগত জীবন পরিচালিত কোরছি। ফল কি হোয়েছে? শিক্ষা দীক্ষায়, বিজ্ঞানে, প্রযুক্তিতে **মানব ইতিহাসের চুড়ান্ত স্থানে উপস্থিত হোয়েও আজ পৃথিবী অশান্তি, অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার আর মানুষে মানুষে সংঘর্ষ ও রক্তপাতে অস্থির।** তাহোলে প্রমাণ হোয়ে যাচ্ছে যে মানুষ তার জীবন পরিচালনার জন্য যে ব্যবস্থা তৈরী কোরে নিয়েছে তা তাকে শান্তি ও নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হোয়েছে। কাজেই মানুষকেই বোঝাতে হবে যে এ পথ ত্যাগ কোরে মানুষের সার্বভৌমত্বকে ত্যাগ কোরে আল্লাহর রসুল যা শিখিয়েছেন সেই আল্লাহর সার্বভৌমত্বে ফিরে যেতে হবে, সেই সার্বভৌমত্বকে গ্রহণ কোরে তাঁর দেয়া দীন, জীবন-ব্যবস্থাকে গ্রহণ কোরে আমাদের জীবনে প্রতিষ্ঠা কোরতে হবে। এই কাজ কি জোর কোরে করাবার কাজ? এটাতো সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায় যে জোর কোরে, শক্তি প্রয়োগ কোরে মানুষকে কোন কিছু বিশ্বাস করানো অসম্ভব।

হেযবুত তওহীদ এই কাজটাই করার সংকল্প কোরছে এবং কোরছে মানুষকে বুঝিয়ে, যুক্তি দিয়ে। আল্লাহর সার্বভৌমত্বে (উলুহিয়াতে) মানুষকে ফিরে আসার আহ্বান কোরছে। এই কাজ করার জন্য হেযবুত তওহীদ প্রক্রিয়া গ্রহণ কোরেছে আল্লাহর রসুলের প্রক্রিয়া, অর্থাৎ তরিকাহ। তিনি কি কোরেছিলেন? মক্কী জীবনের তের বছর তাঁর আহ্বান অর্থাৎ বালাগ ছিলো ব্যক্তি ও দলগত পর্য্যায়ে। তাই তিনি ও তাঁর দল সর্বপ্রকার অত্যাচার, মিথ্যা দোষারোপ, নির্য্যাতন সহ্য কোরেছেন- কোন প্রতিঘাত করেন নি। হেযবুত তওহীদের মোজাহেদরাও আজ তের বছর ধোরে মানুষকে তওহীদের, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বালাগ দিয়ে আসছে, এটা কোরতে যেয়ে তারা বিরুদ্ধবাদিদের গালাগালি খাচ্ছে, অপমানিত হোচ্ছে, মার খাচ্ছে প্রচন্ডভাবে নির্য্যাতিত হোচ্ছে। দাজ্জালের অনুসারী, আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার বিরোধী এদের দ্বারা হেযবুত তওহীদের মোজাহেদরা বহুস্থানে বহুবার আক্রান্ত হোয়েছেন, তাদের আক্রমনে বহু মোজাহেদ সাংঘাতিকভাবে জখম, আহত হোয়েছেন এবং একজন পুরুষ মোজাহেদ এবং একজন নারী মোজাহেদা প্রাণ দিয়েছেন, শহীদ হোয়েছেন। তাদের মিথ্যা প্রচারে ও প্ররোচনায় প্রভাবিত হোয়ে পুলিশ মোজাহেদদের গ্রেফতার কোরছে, তাদের শারিরিক নির্য্যাতন কোরছে, জেলে দিচ্ছে, তাদের নামে আদালতে মামলা দিচ্ছে, এমন কি একেবারে মিথ্যা মামলাও দিচ্ছে। কিন্তু এই তের বছরে শতাধিক মামলার একটিতেও কোন মোজাহেদ আদালতের বিচারে দোষি প্রমাণিত হয় নাই, একটিতেও শাস্তি হয় নাই।

হেযবুত তওহীদের জন্মের সময় থেকেই আমি **নীতি হিসাবে রসুলের এই তরিকা অনুসরণ কোরেছি।** আমার নির্দেশ দেয়া আছে কোন মোজাহেদ কোন রকম বে-আইনি কাজ কোরবে না, কোন আইন ভঙ্গ কোরবে না, কোন বে-আইনি অস্ত্র হাতে নেবে না। যদি আমি জানতে পারি যে কোন মোজাহেদদের কাছে কোন বে-আইনি অস্ত্র আছে তবে আমিই পুলিশে খবর দিয়ে তাকে ধরিয়ে দেব। এই পরিপ্রেক্ষিতে কোন মোজাহেদ কোন বে-আইনি কাজ কোরে কোন অস্ত্র মামলায় আদালত থেকে শাস্তি পায় নাই। কিন্তু তাতে পুলিশের হয়রানি করা থামে নাই। হেযবুত তওহীদ সম্বন্ধে মিডিয়ার (সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি) অবিশ্রান্ত মিথ্যা প্রচারে প্রভাবিত হোয়ে পুলিশ এখনও এখানে সেখানে মোজাহেদদের গ্রেফতার কোরছে, আর কোন অপরাধ না পেয়ে ৫৪ ধারায় অভিযুক্ত কোরে চালান দিচ্ছে কিন্তু স্বভাবতই আদালত থেকে কোন সাজা হোচ্ছে না।

আল্লাহর রসুলের তের বছরের মক্কী জীবনও ছিলো শুধু এক তরফা নির্য্যাতন। তারপর মদীনার মানুষ যখন তাঁর তওহীদের ডাক গ্রহণ কোরল, তখন তিনি হেজরত কোরে সেখানে যেয়ে রাষ্ট্র গঠন কোরলেন। যেই রাষ্ট্র গঠন কোরলেন তখনই নীতি বদলে গেলো। কারণ **কোন রাষ্ট্র কোনদিন ব্যক্তি বা দলের নীতিতে টিকে থাকতে পারে না।** তখন তাঁর প্রয়োজন হবে অস্ত্রের, সৈনিকের, যুদ্ধের প্রশিক্ষণের। আল্লাহর রসুলও তাই কোরলেন- হাতে অস্ত্র নিলেন এবং তখন থেকে তাঁর পবিত্র জীবনের বাকিটার সমস্তটাই কাটলো যুদ্ধ কোরে। অর্থাৎ তওহীদ ভিত্তিক এই সত্যদীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় **ব্যক্তি গোষ্ঠি বা দলগত ভাবে কোনও কেতাল অর্থাৎ সশস্ত্র যুদ্ধ নেই,** আছে শুধু তওহীদের, আল্লাহর সার্বভৌমত্বের আহ্বান, বালাগ দেয়া। ঠিক তেমনি **রাষ্ট্রীয় পর্য্যায়ে আছে সশস্ত্র যুদ্ধ।** রাষ্ট্রীয় পর্য্যায়ে অস্ত্র, যুদ্ধ ইত্যাদি যদি আইন সম্মত না হয় তবে পৃথিবীর সব দেশের সামরিক বাহিনীই বে-আইনি, সন্ত্রাসী। কোরান ও হাদীসে যে জেহাদ ও কেতালের কথা আছে তা রাষ্ট্রগত। হেযবুত তওহীদের মোজাহেদদের বাড়িতে যেয়ে তাদের গ্রেফতার করার কথা ফলাও কোরে কাগজে, রেডিও, টেলিভিশনে প্রচার করা হয়। টেলিভিশনের পর্দায় তাদের হাতকড়া পড়ানো অবস্থায় দেখানো হয়; আর দেখানো হয় আমার লেখা পুস্তিকাগুলি, এই বইটি ও এসলামের প্রকৃত সালাহ, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি। পুলিশ এবং মিডিয়ার লোকজনদের, টি.ভির পর্দায় বুক ফোলানো ছবি দেখে মনে হয় তারা গুপ্তধন খুজে পেয়েছেন। অথচ ঐ বইগুলি আমার নির্দেশে অনেক আগেই বাংলাদেশের অধিকাংশ থানায় মোজাহেদরা নিজেরা যেয়ে পৌঁছে দিয়েছে। দ্বিতীয় কথা হোল বলা হয় ঐ জব্দ করা বইগুলি জেহাদী বই- ওতে জেহাদ ও কেতালের কথা লেখা আছে। জেহাদ এবং কেতালের কথা লেখা আছে বোলে যদি ঐ বইগুলি জব্দ অর্থাৎ বাজেয়াপ্ত করা হয় তবে তাদের কাজটা অসম্পূর্ণ থেকে গেলো; কারণ ঐ বাড়িতেই অন্ততঃ আরও দুইটি বই আছে যাতে **আমার বইয়ে জেহাদ ও কেতাল যতবার লেখা আছে তা থেকে বহুগুণ বেশীবার ঐ শব্দ দুটি, জেহাদ ও কেতাল লেখা আছে।** শুধু লেখা আছে নয় যা করার জন্য সরাসরি আদেশ দেওয়া আছে, এবং কোরলে মহাপুরস্কার এবং না কোরলে কঠিন শাস্তির কথা লেখা আছে। ঐ বই দুইটির একটি আল্লাহর কোর'আন এবং অন্যটি রসুলের হাদীস। ঐ বই দুইটি বাজেয়াপ্ত না কোরে শুধু আমার ছোট ছোট দু'একটি পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত কোরে তা উঁচু কোরে টি.ভির পর্দায় দেখানো অযৌক্তিক, যুক্তিসম্মত নয়।

আমরা কোর'আন-হাদীস দেখিয়ে, যুক্তি দিয়ে, প্রমাণ দিয়ে মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা কোরছি যে তওহীদ ভিত্তিক দীন, জীবন-ব্যবস্থা ছাড়া **মানুষের জীবনের শান্তি ও নিরাপত্তার আর কোন বিকল্প পথ নেই।** বর্ত্তমান অশান্ত, পৃথিবীই তার প্রমাণ। এখানে জোর জবরদস্তির কোন স্থান নেই, মানুষকে জোর কোরে কোন কিছু বোঝানো যায় না এটা সাধারণ জ্ঞান (Common Sense), মানুষ যদি একে গ্রহণ করে তবে দেশে তওহীদ ভিত্তিক দীন, জীবন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, আর যদি মানুষ আমাদের ডাকে সাড়া না দেয়, মানুষের সার্বভৌমত্বকেই, মানুষের উলুহিয়াতকেই আঁকড়ে ধোরে থাকে তবে আমাদের কিছু করার নেই। আল্লাহর যা ইচ্ছা কোরবেন। আর যদি মানুষ আমাদের কথা বোঝে, সাড়া দেয়, দাজ্জালের শেখানো বর্ত্তমানের মানুষের সার্বভৌমত্বকে অর্থাৎ শের্ক ও কুফর ছেড়ে দিয়ে তওবা কোরে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ তওহীদ ভিত্তিক দীন, জীবন-ব্যবস্থাকে গ্রহণ করে তবে তখন আসবে কেতালের অর্থাৎ সশস্ত্র সংগ্রামের, যুদ্ধের সময়। সুতরাং এখন যে হেযবুত তওহীদকে জঙ্গী, জেহাদী, সন্ত্রাসী ইত্যাদি বোলে প্রচার করা হয় তা জঘন্য মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আজ যে হেযবুত তওহীদকে ঐভাবে চিত্রিত করার আপ্রাণ চেষ্টা হোচ্ছে তার বিরাট এবং গভীর কারণ আছে। কিন্তু তা এখানে আলোচনা করার নয়। কিন্তু তাদের এ চেষ্টা ইনশাল্লাহ ব্যর্থ হবে কারণ হেযবুত তওহীদ যে মহাসত্য প্রচার কোরছে তার চেয়ে বড় আর কোন সত্য আসমান ও যমিনে নেই আর তা হোল আল্লাহর তওহীদ, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব।

আল্লাহ সুরা তওবার ৩২ নং আয়াতে বোলেছেন- তারা (কাফের, মোশরেকরা) তাদের মুখের ফুৎকার দিয়ে আল্লাহর নুরকে নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর নুরের পূর্ণ উদ্ভাসন ছাড়া অন্য কিছু চান না, তা কাফেরদের কাছে যত অপ্রীতিকরই হোক। ইনশাল্লাহ তারা হেযবুত তওহীদকেও ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিতে পারবে না।

আল্লাহর দীন (দীনুল হক) প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রকৃত উম্মতে মোহাম্মদীর যে মোজাহেদগণ আরবের মরুপ্রান্তর থেকে এ উপমহাদেশে এসেছিলেন তাদেরই উত্তরসূরী যামানার এমাম, এমামুয্যামান, The Leader of the Time জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী ১৯২৫ সনে টাঙ্গাইলের করটিয়ার হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী পন্নী পরিবারে শবে বরাতের শেষ রাত্রে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের স্কুলের পাঠ শেষে তিনি প্রথমে সা'দত কলেজ এবং পরে কোলকাতায় ইসলামিয়া কলেজে অধ্যয়ন করেন। ছাত্রজীবনেই তিনি ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে যুক্ত হোয়ে পড়েন। সেই সুবাদে মহাত্মা গান্ধী, কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, অরবিন্দু বোস, শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আল্লামা এনায়েত উল্লাহ খান মাশরেকী, মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী এদের সংস্পর্শে আসেন। ১৯৬৩ সালে তিনি প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য (এম.পি) নির্বাচিত হন।

বুদ্ধি হবার পর থেকেই তিনি দেখতে পান সমস্ত মোসলেম জগত কোন না কোন পাশ্চাত্য প্রভুর গোলাম। তখন থেকেই একটি প্রশ্ন তাঁর মনে নাড়া দিতে থাকে যে, মুসলমান বোলে পরিচিত জাতিটিই যদি আল্লাহর মনোনীত জাতি হোয়ে থাকে তাহোলে তাদের এই ঘৃণিত দাসত্বের কারণ কি? একসময় আল্লাহর অশেষ রহমে এ প্রশ্নের জবাব তিনি পেতে আরম্ভ কোরলেন। একটু একটু কোরে, সারা জীবন ধোরে তিনি বুঝতে পারলেন কোথায় সেই শুভংকরের ফাঁকি, যে ফাঁকিতে পড়ে আজ যাদের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি হবার কথা, তারা পৃথিবীর নিকৃষ্টতম জাতিতে পরিণত হোয়েছে। তিনি বুঝলেন, চৌদ্দশ' বছর আগে মহানবী যে দীনকে সমস্ত জীবনের সাধনায় আরবে প্রতিষ্ঠা কোরেছিলেন এবং পরবর্তীতে তাঁর প্রকৃত উম্মাহ অর্দ্ধ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা কোরেছিলেন, সেই দীনটি আর আজ আমরা 'এসলাম ধর্ম' বোলে যে দীনটি অনুসরণ করি এই দু'টি দীন পরস্পর-বিরোধী, বিপরীতমুখী দু'টো এসলাম। ফলে রসুলের নিজ হাতে গড়া জাতিটি এবং বর্ত্তমানের মোসলেম জনসংখ্যাটিও সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। এসলামের সঠিক আকীদা, তওহীদের মর্মবাণী, এবাদতের অর্থ, মো'মেন, মোসলেম, উম্মতে মোহাম্মদী হবার শর্ত, হেদায়াহ-তাকওয়া, সালাতের (নামায) সঠিক উদ্দেশ্য, দীন প্রতিষ্ঠার তরিকা, ৫ দফা কর্মসূচি এবং কিভাবে তাকে প্রয়োগ করতে হয় ইত্যাদিসহ আরো বহু বিষয় তিনি আল্লাহর দয়ায় বুঝতে পারলেন। রসুল ১৪০০ বছর আগে আখেরী যামানায় দাজ্জালের আবির্ভাব সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী কোরে গিয়েছেন সেইসব হাদীসের রূপক বর্ণনা থেকে প্রমাণ কোরলেন যে বর্ত্তমান ইহুদী-খ্রীস্টান যান্ত্রিক 'সভ্যতা'ই হোচ্ছে সেই ভয়ঙ্কর দানব। তিনি তার এ উপলব্ধিগুলি লেখনীর মাধ্যমে প্রকাশ কোরলেন এবং প্রকৃত এসলামকে সারা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে 'হেযবুত তওহীদ' নামে একটি আন্দোলনের সূচনা কোরলেন। এই লক্ষ্যে তিনি তাঁর নিজের সমস্ত সম্পদ অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন এবং সামাজিক অবস্থানকে নির্দ্বিধায় পরিত্যাগ কোরেছেন। তিনি এমন এক পরশপাথর যার সংস্পর্শ মানুষকে জান্নাতের শান্তি দেয়। গত ১৬ বছর ধোরে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও আল্লাহর প্রত্যক্ষ সাহায্যে দৃঢ়চেতা, আত্মপ্রত্যয়ী এ মহান ব্যক্তি নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন হাজার বছরের ফেকাহ, তফসির আর ফতোয়ার পাহাড়ের নিচে যে সহজ-সরল (সেরাতুল মোস্তাকীম) এসলাম চাপা পড়ে রোয়েছে সেই এসলামকে তার মৌলিক, অনাবিল রূপে উদ্ধার কোরে মানুষের সামনে উপস্থিত কোরতে।

যামানার এমামের লিখিত গ্রন্থাবলী
এ ইসলাম ইসলামই নয়
এসলামের প্রকৃত সালাহ্
দাজ্জাল? ইহুদী-খ্রীস্টান 'সভ্যতা'!
হেযবুত তওহীদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
জেহাদ, কেতাল ও সন্ত্রাস
বাঘ-বন-বন্দুক

www.hezbuttawheed.com
ISBN: 978-984-33-1561-8